জানুয়ারি-জুন 1997

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

ঊনবিংশ বর্ষ ~~প্রথম~~-দ্বিতীয়-~~তৃতীয়~~ সংখ্যা দাম পাঁচ টাকা

'এলেবেলে'দের নানান কথা
মেলার পোড়া স্মৃতি, স্মৃতির পোড়া মেলা
সাংবাদিকের কলমে মানবিক অধিকার
পরিবেশ আর পরিবেশ-আইন
জনসেবকের বিড়ম্বনা : প্রসঙ্গ জনস্বার্থ মামলা
শব্দ-ধর্ম-আদালত : কে শোনে কার কথা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বর্ষ 19 সংখ্যা 1-2
জানুয়ারি-জুন 1997

সূচীপত্র

আমাদের কথা.....1
এলেবেলে বোলচাল.....4
মানবিক অধিকার ও সাংবাদিকতা.....10
প্রসঙ্গ : উনিশ-শ সাতানব্বই-এর বইমেলা
স্মৃতি, সুখের আবার বেদনারও.....16
বই মেলা ৯৭.....19
অগ্নিশুদ্ধি.....19
বইমেলার আগুন.....19
বিষয় : পরিবেশ
পরিবেশ আইনকানুন : নাগরিক আধিকার ও কর্তব্য...20
জনস্বার্থ মামলায় বিব্রত জনগণের সেবকগণ.....25
মতামত
একজন অবিজ্ঞানীর বিজ্ঞানপশ্ন প্রসঙ্গে.....28
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ.....29
পরিক্রমা
শব্দ নয়, আদালত বলেছে.....30
নিউক-বিরোধী জনস্বার্থ মামলা হোক.....31
মানুষের ক্লোন আর কতদূর.....31

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী
P 252, লেকটাউন, ব্লক A
কলকাতা 700 089

আমাদের কথা

মাঝে মাঝেই আমরা আর্তনাদ করে উঠি, *বি ও বি'র* পাঠকদের কাছে তা বরং সুপরিচিতই বলা যায়— পত্রিকা প্রকাশ করে যাওয়াটা ক্রমশই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে ; নেই নেই, কিছু নেই, এমনকি গ্রাহক-পাঠকও বোধহয় উৎসাহী নন, উপযুক্ত মানের যথেষ্ট লেখাও পাওয়া যায় না ইত্যাদি। বোধহয় এমনি করেই চলছে — আঠারো পার করে উনিশে পা দিল *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*।

একটু খতিয়ে ভাবার চেষ্টা করছিলাম আমরা। কী আমাদের থাকা উচিত ছিল অথচ নেই, আর কীই-বা আমাদের আছে — আমরা কি তা চিহ্নিত করতে পারি? একথা ঠিকই যে, সময় বড় কঠিন ; মানুষের সময় বড় কম; জীবনের জটিলতা ও যন্ত্রণা ক্রমবর্ধমান। পড়ার অভ্যাস কমে যাচ্ছে — বহু ছোটোখাটো পত্রপত্রিকা উঠে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকাও 'ভালো' চলছে না। ঠাটবাট বদলাচ্ছে। .... নানা কারণ নিশ্চয়ই আছে, হয়তো ইলেকট্রনিক মিডিয়ার রমারমাও একটা কারণ —সে-সব নিয়ে রীতিমতো গবেষণাও হয়তো দরকার। কিন্তু একথাও তো ঠিক, এই বাস্তবতার মধ্যেই আমাদের চলতে হচ্ছে, হবেও। আপসও করতে হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতেও পাঠক কিন্তু বেঁচে আছে। অনেকে মনে করেন — এই বোধহয় ভালো। কেন না, সিরিয়াস পাঠক বাঁচাটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাই সেই টেস্টিং টাইম। এর মধ্যেও তো বইমেলা হয়, বই কাটে, ভালোই। পুড়ে গেলে রাগ-দুঃখ-যন্ত্রণা হয় — আছে বইকি, অনেক কিছুই আছে।

আমাদের নিজেদের প্রকাশিত পাঁচটা বই নেই, টাকা নেই, অফিস নেই, লোকবল নেই। তবুও বিগত কয়েকবছর

বইমেলায় হাজির হচ্ছি আমরা। বিশেষ কিছু প্রকাশকের অল্প কিছু বই আর আমাদের পত্রিকা—এই নিয়ে টেবিলে হাজির হই — 'মেলা' উপভোগ করি। আর প্রতিবছরই এমন দু-চারজনের দেখা পাই যাঁরা এসে বলেন *বি ও বি* এখনও বেঁচে আছে? আমিওতো গ্রাহক ছিলাম, হয়তো চাঁদা বাকি পড়েছিল। মনোযোগ দিয়ে উল্টেপাল্টে দেখেন পত্রিকা। কেউ কেউ পুরোনো সংখ্যা কেনেন, গ্রাহকও হয়ে যান নতুন করে। নতুন গ্রাহকও দুচারজন হন বৈকি। বইমেলায় আমরা 'লাভ' করতে চাই না, তবে কেন যাই? উত্তরটা নিজেদেরও জানা নেই। কিন্তু বোধহয় ওইসব মানুষের জন্যই।

তা *বি ও বি* পত্রিকা চলার কি দরকার? কেন চলছে? এটা তো সত্যি, আমরা কোনোদিনই *বি ও বি*-কে একটা বাজার-চলতি পত্রিকা করে তুলতে চাই নি। প্রথম থেকেই আমরা চলেছি অপ্রচলিত পথে। চটকে, ঠমকে , আড়ম্বরে আমরা তো বিশ্বাস করি নি কোনোদিন। আমাদের বিশ্বাস ছিল, এখনও আছে — *বি ও বি* যদি বাঁচে, বাঁচবে কর্মীদের স্বেচ্ছাশ্রমে, পাঠকদের—হোক তা সীমিতসংখ্যক — আগ্রহে ও অংশগ্রহণে।

বিদেশী বা দেশী কোনো অনুদানেই আমরা পুষ্ট নই, বিজ্ঞাপনও আমাদের মুখ ঢেকে দেয় না, কোনো স্বনামধন্য বহু বিজ্ঞাপিত পরিচিত ভারী নাম আমাদের উপদেষ্টা বা পৃষ্ঠপোষক হিসেবে শোভা পায় নি, পায় না, তাহলে আমরা বেঁচে আছি কিভাবে ও কেন?

প্রশ্ন, প্রশ্ন আর প্রশ্ন। প্রশ্ন করতে করতেই উত্তর ধরা দিল —*বি ও বি* এখনও বেশ কিছু মানুষের আগ্রহের পত্রিকা, সংগ্রহের পত্রিকা। মানুষের কাছে আমরা থাকতে চেয়েছি, পাশে পেতে চেয়েছি, ব্যতিক্রমী সিরিয়াস কিছু মানুষের ক্ষীণ একটা স্রোতের ধারায় আমরা তো আগাগোড়া নিশ্চিন্ত হয়েই চলেছি। কে বলে আমাদের কিছু নেই। কোনো রসদ নেই? আছে, আমাদের আছে শেষ সম্পদ, মানবসম্পদ। কর্মী হিসেবে, সহমর্মী হিসেবে, পাঠক হিসেবে এ-যাবৎ এই আঠারো বছর ধরে আমরা যাদের পেয়েছি, তাঁরাই আমাদের সম্পদ। হতে পারে তাঁদের অনেকের গ্রাহক/সদস্য চাঁদা দীর্ঘদিন বাকি। কিন্তু আমাদেরও তো সুষ্ঠু কোনো পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা নেই চাঁদা সংগ্রহের।

তাছাড়া আমরা বরাবর মনে করে এসেছি, বলে এসেছি সুযোগ পেলেই, যে, প্রচলিত ধরণের সংগঠন — কাঠামো এবং পদ্ধতি উভয়দিক থেকেই সৃষ্টিশীলতাকে ধারণ ও পোষণ করতে অক্ষম। তা শুধু জন্ম দেয় পদাধিকারের, উচ্চ-নীচ ক্রম, আদেশ করা ও তা পালন করার একঘেয়ে, ক্লান্তিকর, ব্যক্তি অবমাননাকর, অগণতান্ত্রিক একটি বেড়াজালের। এতদিন আমরা এই পত্রিকায় এড়িয়ে চলতে পেরেছি — এবার সময়, একে সংহত ও উন্নতভাবে কাজে লাগানোর। আর একটি ব্যাপারও আছে। . . . ছোটো ছোটো পত্রপত্রিকা বা বিশেষ উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া ছোটো ছোটো গোষ্ঠীরা — আজ থেকে দশবছর আগেও যেভাবে কাজ করত, সরকারি বা বেসরকারি সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানও কৌশলগতভাবে সেই একই পদ্ধতিতে কাজ করত। ফলে ছোটোরাও ক্ষেত্রবিশেষে গুরুত্বের দাবি করত ও পেত। কিন্তু আজকের বাস্তব পরিস্থিতিতে ছোটো ছোটো গোষ্ঠী/পত্রিকা কৃৎকৌশলগত কারণে — অর্থের অপ্রতুলতার কারণে — পিছিয়ে পড়েছে বাধ্য হয়েই। নতুন পরিস্থিতি দাবি করে সংগঠনের নতুন পন্থা, পদ্ধতি এবং কারিগরি কৃৎকৌশলের সুচিন্তিত ব্যবহার। তা নাহলে প্রথাগত ভারী ভারী প্রতিষ্ঠান অর্থ, কৃৎকৌশল তথা টেকনোলজি, লোকবল ইত্যাদি নিয়ে ব্যক্তি-মানুষের ওপর চেপেই বসবে — সুস্থ, ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনা, নির্ভীক পর্যালোচনার কোনো দামই আর থাকবে না .. .. .।

এসব ভাবনা চিন্তার নিবারণে আমরা কয়েকটি নতুন পদক্ষেপ নিতে চলেছি। পদক্ষেপগুলি উল্লেখ করার আগে আর একবার আমাদের নীতিগত অবস্থানটাকে পরিষ্কার করে বলা যাক—আমাদের পত্রিকা *বি ও বি* বা যে সংগঠনের দ্বারা তা প্রকাশিত সেই 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা' একটু ব্যতিক্রমী পত্রিকা বা সংগঠন। ব্যক্তিবিশেষ এখানে কম বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কখনই নয় পদাধিকার বলে। কাজ করার সুযোগ ও স্বাধীনতা সকলে সমানভাবে পেয়ে এসেছেন, সবসময়—যে কেউ আমাদের দপ্তরে দু-চারবার এসেছেন, স্বীকার করেছেন সে-কথা অকুণ্ঠচিত্তে। আমাদের এই 'পরিবারে' থাকা না-থাকার ব্যাপারেও ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন। স্বেচ্ছামূলক পারস্পরিক সহযোগিতাই আমাদের শক্তি, আমাদের দুর্বলতাও। এই অর্থে *বি ও বি*'র

পাঠকমণ্ডলীও একই পরিবারভুক্ত। যিনি বা যাঁরাই স্বেচ্ছায় অনেকদিন ধরে *বি ও বি* পড়েছেন — তিনি বা তাঁরা সকলেই আমাদের সহকর্মী, সহমর্মী বা সহযোদ্ধা। আমরা এঁদের একটি নামের তালিকা প্রকাশ করব। এঁদের কেউ কেউ অন্য বৃহত্তর কাজে লিপ্ত হয়েছেন, কেউ-বা নিতান্তই জীবন ও জীবিকার কারণেই হয়তো দীর্ঘদিন আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা অবশ্যই আমাদের সহমর্মী। আমাদের তালিকা এখনই সম্পূর্ণ হচ্ছে না, এবং খোলাও থাকছে। এদের সকলের সাথেই আমরা যোগাযোগ করতে চাই। অথচ সকলের ঠিকানা আগেরটাই আছে কিনা সঠিকভাবে জানা নেই। তাই ঠিক করেছি, আপাতত যাদের ঠিকানা নিশ্চিতভাবে ঠিক বলে জানি তাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব। চিঠির মাধ্যমেই হতে পারত সেটা। তবে তা করছি না। আমরা পত্রিকাটাই পাঠাব ঠিক করেছি । — হয়তো ভালো লাগবে বহুদিন বাদে, আবার তাদের এককালের প্রিয় পত্রিকাটি হাতে পেয়ে — এই ভেবে। *বি ও বি* কেমন ছিল — এখন কেমন দাঁড়িয়েছে আঁচ করতে পারবেন তাতে। দেখে আনন্দ বা বেদনা যে-কোনোটাই হতে পারে। সে বিচার তাঁরাই করবেন। এবং এই উদ্যোগকে টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন কি-না তাও বিবেচনা করবেন। হয়তো এমনও হতে পারে, কেউ কেউ কিছু করার কথাও ভাবতে পারেন। হয়তো তেমন সুযোগ ও অবসরও আছে। তাতে শুধু এই উদ্যোগটাই পুষ্ট হবে এমন না — যে গুটি কয়েক ব্যক্তি এই উদ্যোগটি টিকিয়ে রেখেছি, তারাও খানিক উৎসাহ পাব। আর সব থেকে বড় প্রাপ্তি যেটা হবে তা হলো — পুরোনো বন্ধুকে ফের কাছে পাওয়ার আনন্দের অনুভবটুকু। আসলে *বি ও বি* কখনও বড় প্রতিষ্ঠান বা দক্ষ ও সফল সংগঠন হতে চায় নি। চেয়েছে যা, তা হলো অল্প হলেও কিছু মানুষ যে 'কিছু কিছু চর্চা ও ভাবনায়' কাছাকাছি আছে — এই অনুভবটি জিইয়ে রাখতে। দূরে থাকলেও এর শরিক কারো সাড়া পেলে আনন্দে আপ্লুত হবো — বলাই বাহুল্য। তা সে যেভাবেই হোক। একখানা পোস্টকার্ড মারফৎ পত্রিকার প্রাপ্তি স্বীকার হলেও। অবশ্য নতুন সদস্য/গ্রাহক করার যে প্রক্রিয়া চলছে তা চালু থাকবে।

আমরা জানি *বি ও বি*-র কাছে তার পরিবারের সদস্য তথা সহকর্মীদের প্রত্যাশা খুবই কম। তাও সেই প্রত্যাশা কি তা স্পষ্ট হয়ে উঠুক, ন্যূনতম কোনো প্রয়াজন যদি *বি ও বি* না পূরণ করতে পারে, তবে তার মৃত্যুই ভালো। *বি ও বি*-কে সেই ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর উপযুক্ত করে তোলার জন্য সাধ্যমতো সক্রিয়তা ও সাহায্য — একটা নতুন পথের সন্ধান দেবে এ বিশ্বাস রাখি। তবে সেটা কেমন হবে, তা সহকর্মীরাই ঠিক করে নেবেন।

বিধিসম্মত ঘোষণা

1956 সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের 4 নং ফরম অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

পত্রিকার নাম : বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

প্রকাশনার ভাষা : বাংলা ও ইংরেজি

প্রকাশনার স্থান : পি 252, লেকটাউন, ব্লক A,
কলকাতা 700089

প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা : রবীন মজুমদার,
ভারতীয়,
কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগ,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
92, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলকাতা 700009

মুদ্রকের নাম ও ঠিকানা : ঐ

সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা : ঐ

মুদ্রণ স্থান : ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি,
117, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট,
কলকাতা 700 009

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরিউক্ত তথ্যাবলী আমার জ্ঞান ও বিবরণ মতে সত্য।

সাক্ষর

রবীন মজুমদার

এলেবেলে বোলচাল

অমল সোম

লেখাটি আমাদের একটি বন্ধু-সংস্থা সম্পর্কে। লেখা হয়েছিল সংস্থার মধ্যেই আলোচিত হবে বলে। লেখার ভঙ্গিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। লেখাটির মধ্যে সাংগঠনিক উদ্যোগ সম্পর্কে এবং একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে কিছু অপ্রচলিত ভাবনা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির আভাস রয়েছে। তাই সেই আলাপচারিতার জন্য লিখিত বিষয়বস্তুটিকেই প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয় 'বি ও বি'। লেখার ভঙ্গি একটু আধটু বদলানোর চেষ্টা নেওয়া হয়েছিল — সম্ভব হয় নি। ফলে দু-এক জায়গায় এক-আধটু ছন্দপতন হওয়া অসম্ভব নয়। সে ত্রুটি সম্পাদনার। উল্লিখিত সংস্থার নাম বলা হয়েছে 'এলেবেলে সংস্থা'। বোঝাই যায় আসল নাম নয় এটি। এছাড়াও আছে ব্যক্তি-নাম। যেমন ডাক্তার খোলামেলা অথবা আলাভোলা দাদা। এই ছদ্মনামের পেছনেও আছে বা ছিল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি। লেখক সে-সব নামও প্রকাশ করতে চান নি। আসলে 'সবাই বলে আমায় দেখ'-এর হুজুগ চলছে চারদিকে। হয়তো সে হুজুগে জড়াতে চান নি লেখক। সম্ভবত আরো বোঝাতে চেয়েছেন যে, একমাত্র তাদের সংস্থাই নয়, এমন অজানা অনেক সংস্থা, অজানা স্থানে সবার দৃষ্টির আড়ালে এভাবেই পথের সন্ধানে ব্যাপৃত। আজ পাদপ্রদীপে যে নেই বা যারা তাদের উপস্থিতি সদম্ভে জাহির করছেন না তারাই তো 'এলেবেলে'। সেই এলেবেলেদের ভিড়ে 'বি ও বি'ও আছে। আছে তার বেশিরভাগ পাঠকও। তাই আলোচ্য 'এলেবেলে' সংস্থাটির নাম জানানোয় দোষের হবে না মনে করছে 'বি ও বি'। এই সংস্থাটি হলো মনোরোগীদের জন্য — তাদের আত্মীয়-বন্ধুদের মিলিত উদ্যোগ 'মানস'।

— স.ম.

'এলেবেলে' মানসিক রোগী, তাদের পরিবার ও এই দুই দলের প্রতি সহমর্মী মানুষজনদের একটি সমবেত যাত্রা, একটি যৌথ প্রয়াস। কিসের প্রয়াস? কোন্ "নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে"? — Quo Vadis?

এককথায় স্ব-শাসিত, আত্মবিজড়িত (Self organised, self involved) মানসিক রোগ চিকিৎসাব্যবস্থার একটি সহনীয়, বিভীষিকাহীন, আশাবাদী রূপের খোঁজে।

কি সেই রূপ? আমরা জানি না। কেউ কি তা জানে? তবে 'এলেবেলেরা' সেই রূপের স্ফূটনের জন্য তিল তিল করে কয়েকটি আঁচড়-মাত্র কাটতে পেরেছে, পাষাণ প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা এখনো বিপুল সুদূরে।

তবু একটা কথা ধেয়ানে রাখতে হবে — মানসিক রোগী, তাদের পরিবার, বন্ধুজন, বিশেষজ্ঞ-অবিশেষজ্ঞ, জ্ঞানীমূর্খ, রোগাভূত, মোটাভূত, বাবাভূত, ছানাভূত — তাবৎ এলেবেলেদের নিয়ে এই যে এলোমেলো এলেবেলে যাত্রা — এই যে চিকিৎসক, কর্মী, চিকিৎসিত, ঘরের লোক, বাইরের লোকের একাকারত্ব — প্রায় বিশুদ্ধ non-hiararchy অর্থাৎ উচ্চ-নীচ-ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, 'দাদাগিরিহীনতা'র পরম অনুশীলন — এর উদাহরণ ভূভারতে কেন, সারাবিশ্বেও তুলনাহীনা। 'এলেবেলেদের' এই যাত্রার মেজাজে ও চালেই সে অনন্য, অপরূপ।

'আমরা সবাই রাজা'

'এলেবেলেতে' ব্যক্তি বড় না সংগঠন বড়, গণতন্ত্র আছে কি না আছে — এই নিয়ে কখনো-সখনো প্রশ্ন ওঠে না এমন না। তথাপি বলতেই হবে, অন্তত চারপাশ দেখেশুনে স্বীকার করতেই হবে যে এমন উদার, খোলামেলা, কূট-কচালিবিহীন, কে কোথাধ্যক্ষ, কে সভাপতি আর কারা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, কে-বা সর্বঘটেই আছে অথচ আদৌ সদস্যই নয় — এ নিয়ে কারোরই কোনোদিন মাথাব্যথা নেই, কাড়াকাড়ি নেই, স্বাভিমান

নেই। কে ডাক্তার, কে রোগী, কে অভিভাবক, কে পুরোপাগল, আধাপাগল, সিকিপাগল, কে কার নির্দেশে চলছে, কে খাটছে, কে কাকে খাটাচ্ছে — সব মিলেমিশে একাকার। আর যারা কাজ করে তারা কাজই করে, করেই যায়। তাদের মধ্যে পদাধিকারের অভিমান বা আত্মগর্ব বা হীনমন্যতার তুচ্ছতা নেই কখনো।

এলেবেলেদের নিয়ে এতদিনের, এত সুখ্যাতির একটা সংস্থার বাজারে নামী ও দামী সংস্থা—উজালা করিয়ে কোনো একজনও কি এলেবেলে-সংস্থার পুরোভাগে বা পরিচালনায় আছে? নাহ্! তাই বলে মানুষ হিসাবে উঁচুমানের, উঁচুমাপের জ্ঞানীগুণীজনের আকাল 'এলেবেলে'-তে কোনোদিনই হয় নি। কিন্তু এখানে কেউ কখনো নিজেকে জাহির করেন না, কারো ওপর জোরাজুরিও করেন না, এলেবেলে হয়েই এলেবেলেদের দলে ঘাপটি মেরে মিলেমিশে থাকেন। নিজেকে জাহির না করার এই হলো এলেবেলে মেজাজ বা এলেবেলে ঘরাণা। পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন *ভবঘুরে শাস্ত্র* লিখেছেন, ডস্টয়েভ্স্কি লিখে গেছেন 'অভাজন' উপন্যাস, হারবার্ট মারকুস সমাজে উপেক্ষিত অপাংক্তেয়দের নিয়ে বিপ্লব-তত্ত্ব ফেঁদেছেন। এইসব আরো অনেক কিছুর বদ্‌হজমে এই এলেবেলের প্রলাপ। মানসিক রোগীরা তো এক্কেবারে আগ-মার্কা এলেবেলে। অতীত তাদের যত কীর্তিধন্য হোক্ না কেন, একবার পাগলের দলে নাম উঠে গেলেই তারা হয়ে পড়ে নিতান্তই এলেবেলে। কিন্তু যেটা অনেকেরই নজর এড়িয়ে যায়, সেটা হলো মানসিক রোগীর পরিবারের লোকজনদের মানসিক ডিগ্‌বাজী। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদেরও যতই দাপট ও লম্ফঝম্প থাকুক না কেন, বাড়ির রোগীটিকে নিয়ে তারা যখন ডাক্তারের চেম্বারে যান বা কোথাও ভর্তি করাতে নিয়ে যান — দেখেছি তাদের চুপ্‌সে যাওয়া মুখ, কুঁকড়ে যাওয়া মন। তাদের বিদ্যেবুদ্ধি, জ্ঞানগম্যি, অর্থসামর্থ্য সবকিছু নিয়েও এই সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তারা বেজায় ভেব্‌লে যান—তারাও হয়ে পড়েন এলেবেলে।

এদের সকলের জন্য আর অন্যদের জন্যও বটে, প্রয়োজন এলেবেলে-শাস্ত্র। আর ভেব্‌লে-যাওয়া ভাবটি কাটিয়ে ওঠার একটি উপায়ইতো দেখি — এলেবেলেদের নিয়ে দল পাকানো। কল্পনা-বাস্তবের মিশেলে এমনই একটি সংস্থার 'কাহিনী (হে পাঠক) শোনাই শোনো'। আমাদের আলোচ্য সংস্থাটির নামটিও দিলাম 'এলেবেলে'। ঝাঁ চক্‌চকে, এলিটিস্ট, স্বদেশী বিদেশী দান ধন্য এন. জি. ও. (নন গর্ভমেন্টাল অরগানাইজেশন)-গুলির যে রূপদর্শন আমাদের অনেকেরই মন ধাঁধায় —এই এলেবেলে সংস্থার রূপ কল্পনা তারই প্রতিবাদী ভাবনা। এই প্রতিবাদ — একি অলীক, একি দিবাস্বপ্ন, না কি দেখুন তো আপনাদেরই আশেপাশে এরকম এলেবেলেরা, নিধিরাম সর্দারেরা কোথাও লড়ে চলেছেন কিনা তাচ্ছিল্যভরে 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া'!

এলেবেলে চরিত চারণ

'এলেবেলে' কি, কেন, এলেবেলে কোন্ দিকে — এতসব হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে এর সার্ভিস, প্ল্যান, প্রোগ্রাম, প্রজেক্ট, বাজেট —এখানে কিছুই যাবে না ধরা। চরম উত্তরোলের মধ্যে এলেবেলের মূল সুরটি ধরার জন্য এলেবেলেতে লেগে থাকা দু-একজনের মানসচর্চন করা বরং ভালো। আর এইসব খণ্ড-মানস (খণ্ডিতমানস বা **split personality** নয়) জুড়ে জুড়েই এলেবেলে-মানসের পূর্ণাবয়বের খানিকটা আভাস পাওয়া সম্ভব।

প্রথম চরিত-কথা এলেবেলের মানসিক রোগ চিকিৎসক (সাইকিয়াট্রিস্ট) ড. খোলামেলা-র। ড. খোলামেলা এখন কলকাতার কেউকেটা সাইকিয়াট্রিস্টদের মধ্যে অন্যতম একজন। আপনি তার নার্সিংহোমে যান, প্রাইভেট চেম্বারগুলোয় যান দেখবেন তিনি কেতাদুরস্ত সফল একজন প্রফেশনাল। তবু এসবে কি তার মন ভরে না? কেন তিনি এলেবেলে করেন?

সাতসকালে ট্রেনের ধকল পেরিয়ে ধ্যাড়ধেড়ে গ্রামে রোদে জলে কাদায় গ্রামের ক্লিনিকে তিনি যাচ্ছেনই, যাচ্ছেনই, যাচ্ছেনই। টাকা পয়সা পাওয়া তো দূরের কথা, পয়সা দিয়ে ক্যান্টিন থেকে কিনে দুপুরে খাওয়া সেরে নেন। এদোঁ ঘর, এলেবেলে নড়বড়ে যত স্বেচ্ছাসেবী-সহকারীর দল, তার মধ্যে কয়েকজন আবার এখনো চিকিৎসাধীন—কিছুটা সেরে ওটা আঞ্চলিক রোগীও আছেন। কাজের চেয়ে এসবে মিলে অকাজই করে বেশি— প্রেসক্রিপশনের কপির সাথে উল্টো করে ল্যাগানো কার্বন-পেপার, একের প্রেসক্রিপশনের সাথে আরেকজনের কেস্-হিস্ট্রির পাতা, স্ত্রীর জায়গায় পুরুষ, এক ওষুধের বদলে আরেক ওষুধ, স্টকে কি ওষুধ আছে না-আছে তার হিসাব নেই — এরকম অজস্র মাথা গরম করা কাণ্ড-কারখানা। কাজের পরিবেশও আহামরিমরি! হৈ হট্টগোল, পর্দা তুলে উঁকিঝুঁকি মারা লোকজন, প্রাইভেসির 'পি'ও না-মানা যত অভব্যের উৎপাত! এতদ্‌সত্ত্বেও ড. খোলামেলা ক্লিনিকটি থেকে মনের কি আরাম বা খোরাক পাচ্ছেন? কিছু না কিছু পাচ্ছেন তো বটেই! না হলে দিনের পর

দিন আনন্দ ও উদ্দীপনার সাথে স্বেচ্ছায় কেউ এই কষ্টস্বীকার করতে পারে কি?

ভেবে ভেবে বোঝা যায় যে, সফলতম কোনো কোনো পেশাদারেরও মনের সংগোপনে একটি সংবেদী সামাজিক সত্তা চাপাচুপি থাকে। পেশাদারি মঞ্চ যে সত্তার চাহিদা মেটাতে পারে না। সেই মন তখন চায় এমন এক বিচরণ ক্ষেত্র যেখানে তার প্রধান পরিচয় সে মানুষের বন্ধু। "আমি তোমাদেরি লোক, আমার যা কিছু দক্ষতা, বিশেষ জ্ঞান আছে তোমরা তা কাজে লাগাও, ভাগ করে নাও।"—এই হলো তার প্রাণের আকুতি। সেই মঞ্চে তার সাথে অন্যদের সম্পর্ক, বিশেষজ্ঞ সার্ভিস বেচাকেনা নয়।

তাই ড. খোলামেলা-র মতো দক্ষ পেশাদারকে 'এলেবেলে'র তো নিশ্চয়ই প্রয়োজন—রোগীদের চিকিৎসার স্বার্থে। তেমনি উল্টোদিকে সেই ভেতরকার সমাজমনস্ক সংবেদনশীল মানুষটির নিজের মানসিক স্বাস্থ্য ফুল্লকুসুমিত রাখার তাগিদে, পেশাদারি কাজের আগ্রাসী শিখায় নিজে ভস্মীভূত (Burntout syndrome) হওয়ার পরিণতি এড়াতে 'এলেবেলেদের' মিছিলে সামিল হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন কিছু এলেবেলে, কিছু এলোমেলো কম্মসম্ম করার আঙিনা ও —'আমার ছুটি অবেলাতেই দিন-দুপুরের মধ্যিখানে।' —তাই ড. খোলামেলা এলেবেলেতে আসে, এলেবেলেতে থাকে, চলে যায় না, চলে যাবে না, চলে যেতে পারে না।

হায়! গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা ?

আলাভোলা দাদা। আলাভোলা একজন অবসরপ্রাপ্ত জীবন বীমা কর্মচারী। যৌবনে এদেশে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথমদিকের একজন কর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পুরোধাদের অন্যতম। পরে অতিবাম রাজনীতি, গান্ধী-মার্কস-মাও পরিক্রমণ শেষে তার মনে হলো মানুষ আর মানুষের মনটা বোধহয় বাদ পড়ে গেছে সবারই এজেণ্ডায়। অথচ শ্রেণী লিঙ্গ বয়স জাতপাত উচ্চনীচ নির্বিশেষে মানুষ মাত্রেরই প্রতি — অথবা শুধু মানুষই বা কেন অবুঝ অবোধ পশু-পাখি গরু-ছাগল কাক কুকুর সর্বভূতেষু "ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা"। আলাভোলা দাদার এই ভালোবাসাবাসি মন পার্টি, সক্রিয় রাজনীতি, নানাবিধ সাংস্কৃতিক সামাজিক কাজেকর্মে চিরপিপাসিতই থেকে গেছে। বুঝি তাই, অনেক শৈশবের লীলাভূমি, যৌবনের উপবনে ইতস্তত সঞ্চরণের অন্তে আলাভোলাদাদার বার্দ্ধক্যের বারাণসী হয়ে দাঁড়াল এই এলেবেলেদের মাঠপুকুর বাঁশবন তাল নারকেল শোভিত গ্রামীণ ক্লিনিকটি। এসেছিলেন 'কি করি আজ ভেবে না পাই' গোছের মাইনর সমস্যা নিয়ে। সেই যে এলেন, তড়িতাহত হবার মতো এলেবেলেদের সাথে একেবারে সেঁটেই রইলেন। জ্যেষ্ঠ্যা কন্যার অপঘাতমৃত্যু, নানান দুঃখতাপ সবকিছু আত্মলীন করে এলেবেলেকে বুকের ধনের মতো আগলে রেখে কিছু লোক হাসালেন, কাউকে কাউকে রাগালেনও। যত উৎক্ষিপ্ত ছিন্নবস্ত্রজীর্ণ করা আত্মহননেচ্ছু, উগ্র, ঘেঁটে যাওয়া আকুল-বাতুলদেরও পরম মমতায় প্রায় কোলে করে আদরে সারিয়ে তুলতে চাইলেন। আর এইসব আদিখ্যেতার জন্য ধমকধামকও খেলেন। ভাঙা হাতে পায়ে, মাইলের পর মাইল ভারী বোঝা ভরে গ্রামীণ ক্লিনিকটির জমির ডাল, কলা, পেপে, নারকেল বয়ে নিয়ে চললেন হাওড়া কলকাতার ঘরে ঘরে ফিরি করে এলেবেলে সংস্থার অর্থসংস্থানের তাগিদে। এলেবেলেদের জন্য সদা উপুড়-হস্ত, ব্ল্যাংক চেক বিলোনোর মধ্যে কি তৃপ্তি পেতেন আলাভোলা দাদা? সংস্থা কি রকম হবে এর কোন্ ভবিষ্য ছবিই বা তার মনের পটে ছিল লিখা? আজ তা জানার উপায় নেই। কেননা কিছুকাল আগে প্রয়াত হয়েছেন আলাভোলা দাদা 'এলেবেলে' করা কালীন, 'এলেবেলে' ছাড়া অবস্থায় নয়।

এলেবেলে সংস্থার প্রয়োজন ছিল, কি ছিল না, কতটুকু বা কতখানি প্রয়োজন ছিল এটা কোনো পোস্ট-মর্টেমের অপেক্ষা রাখে না। যারা এলেবেলে মিছিলে ছিলেন ও আছেন, তারা মর্মে মর্মে এলেবেলেদের প্রতিটি কাজের অনুষঙ্গে তাকে 'মিস' করেছেন, স্মরণ করছেন, সেলাম জানাচ্ছেন। 'এলেবেলে'র পাতায় পাতায় প্রতি ইঁটে আছে লিখা — এই আপনভোলা আউলবাউল লোকটি কত বাড়াবাড়ি রকম, হয়তো বা ভারসাম্য হারানোভাবেই 'এলেবেলে'ময় ছিলেন। কিন্তু উল্টোদিকে একথাও মনে রাখতে হবে যে আলাভোলা দাদার মতো বিক্ষুব্ধ আলোড়িত সমুদ্র-হৃদয়েরও বহু ঝঞ্ঝা-ঝড়-মৃত্যু-দুর্বিপাকের গোধুলি লগনে এলেবেলে সংস্থার মতো তটভূমির প্রয়োজন ছিল।

এইখানেই 'এলেবেলে'র জোর, সাফল্যের চাবিকাঠি। 'এলেবেলে' হরেকরকম প্রাণের, হরেকরকম আকুতি, অতৃপ্তির চাহিদা মেটাবার আবকাশ রাখে। যাদেরকে 'এলেবেলে'র প্রয়োজন তাদেরও এলেবেলেকে প্রয়োজন। এই লেনাদেনার তালগোলনই এলেবেলের মর্মবাণী।

যা না-চাইবার তাই আমি চাই গো
না পাইবার তাই কোথা পাই গো?

কেউ কেউ চান আর পাঁচটা 'সার্থক' স্বেচ্ছাসেবী (N. G. O.) সংস্থার মতো এলেবেলেরও চকমকে অফিস, ঝকমকে লোকজন, তক্‌তকে প্রোগ্রাম—এসব থাকুক। যে কোনো রঙের সাদা কালো রুপি ডলার ডিয়েম ফ্রাঁ গাড়িবাড়ি রিসার্চ-সেমিনার ওয়ার্কশপ-জনসচেতনতা, স্বদেশী-বিদেশী সাহেব-সুবোদের সাথে দহরম-মহরম, পুলিশ-পঞ্চায়েত-সরকার-মালিক, প্রচার ইনটারনেট-এন. আর. আই এইসব কিছু 'কাজে লাগিয়ে' ফুলে-ফেঁপে উঠুক 'এলেবেলে'— এই তাদের একান্ত কামনা। এলেবেলে'কে ভালোবেসে ভালোমনেই তাদের এই বাসনা। তারা গুম্‌রে মরেন এলেবেলের লড়্‌ঝড়ে অবস্থা দেখে। তারা মনে করেন, বাজারে এলেবেলের ক্রেডিবিলিটি (credibility) এত 'হাই' (high) আর এলেবেলে কিনা সে সুযোগ হেলায় হারাচ্ছে। তাবৎ পৃথিবীর Funding Agency-রা সম্পদ বিলোবার জন্য বসে আছে — বিশ্বের কোণে কোণে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা এন. জি. ও.-রা সেই সব টাকাকড়ি কব্জা করে তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে চলেছে আর এলেবেলে কিনা টাকা নেই, কাজের লোক নেই, জায়গা নেই, এই নেই, ওই নেই ! —হা হুতাশ করে ধুঁকছে। অনেকের বুকের ভিতর 'ইস্‌! ইস্‌!' নিশপিশ করে — "ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি? টাকা পয়সা আনো, কাজের লোক কিনে নাও—লোকের অভাব কি?" এরা ভেবেই পান না আজকের এই তরতাজা বিশ্বে নির্দিষ্ট সময়ের (time-bound) প্রজেক্ট বা লক্ষ্যসূচী (target) এবং তার মূল্যায়ন (evaluation), বৈজ্ঞানিক পরিচালনা (scientific management), আঁটোসাঁটো পেশাদারিত্বের (professionalism) পরাকাষ্ঠা হয়ে উঠতে 'এলেবেলে'র বাধাটা কোথায়? কেনই বা 'এলেবেলে' উটের মতো বালিয়াড়িতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে? —এদের ক্ষোভ, এদের আক্ষেপ। 'এলেবেলে' কি হতে পারত আর কি হয়ে আছে? এমন "জিনিস রইল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা।"

এরা সব কেনাবেচার বাজারি বিশ্বদর্শনের ভাবশিষ্যকুল। এরা সব কেজো পৃথিবীর দাপুটে কাজের মানুষ। 'Hire and Fire', 'accountability' — এই হলো এদের ভাবাদর্শ এবং কর্ম-সংস্কৃতি যুগের তালে তাল মেলানো ভাবনা। ওদিকে এলেবেলে চিরকালই অকাজের কাজি, বেপথুমান।

চাইলেই এলেবেলে যা হয়ে উঠতে কোনোদিন চায় নি, চায় না তা হয়ে উঠবে কেমন করে? কি হয়ে উঠতে চায় এলেবেলেরা —এটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কিভাবে কোন্ পথে এলেবেলেরা সেই হয়ে ওঠার দিকে এগোবে—এটাও ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ।

তাই আদত কথাটা হলো হাসাপাতাল হোক, কুটির হোক, অতিথিশালা হোক, দিবা-আবাস হোক, মানসিক রোগচিকিৎসা-পরিষেবা-পুনর্বাসন-সামাজিকীকরণের যে কটা পরিচিত রূপ (form) আছে এবং ভবিষ্যতের যে যে আজ-না-জানা ফর্ম উদ্ভূত হতে পারে তার কোন্ রূপের (form)—আরাধনা 'এলেবেলে' কোন্ স্তরে এসে করবে, ধরা হবে, করা হবে, তাই এলেবেলেতে জড়ো হওয়া অনেক অনেক মানুষের 'হিয়া-অমিয়-মথিয়া' এসবের কোনো পূর্ব-নির্ধারিত (pre-conceived) ছক থাকে না, থাকতে পারে না। ছক না থাকার একটি বড় কারণ এই যে, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক, এ তাবৎ উদ্ভূত ছকে এলেবেলেতে জড়ো হওয়া মানুষগুলোর মানসিক চাহিদা, প্রয়োজন ও হাহাকারের জবাবী সুতো গাছাটি পর্যন্ত মেলে না। যেমন এই হাহাকারটির কি উত্তর আমরা দিতে পারি?

ডাকসাইটে হেডমাস্টার। দুই পুত্র, এক কন্যা, স্ত্রীকে নিয়ে জমাটি সংসার। মেয়েটি ছোটো থেকেই কেমন যেন ; মা আগলে আগলে রাখেন। বাবা বড় রাশভারি। পয়সা প্রতিপত্তি, সম্পত্তি বাড়ি কোনোটারই অভাব নেই। ছেলেরা দাঁড়িয়ে গেল—ভালো চাকুরি, বৌ-বাচ্চা নিয়ে সুখের সংসার। মেয়েটির লেখাপড়া বিশেষ হলো না—খেয়ালিপনা, গান গায় ভালো। মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী গত হলেন। বৌমাদের রাজত্ব। এরপরই যেন ঢেকেঢুকে রাখা, চাপাচুপি ভারসাম্যটি বেমানান হয়ে উঠল। মেয়েটি পুরোপুরি অপ্রকৃতিস্থ, ঘরে রাখার অযোগ্য মানসিক রোগী। মা বেঁচে থাকতে কি কৌশলে কোন্ মন্ত্রগুপ্তিতে এতদিন ঠেকাঠুকি দিয়ে একে ঘরের মধ্যে সামলে রেখেছিলেন কে জানে? সময়মতো চিকিৎসাই হয় নি এ-যাবৎ। এখন নাও ঠ্যালা। মনে জট পাকিয়ে গেছে অনেকটাই। উৎপাত বাড়লে নার্সিংহোম, পয়সায় টান পড়লে আধাআধি অবস্থাতেই বাড়ি ফেরৎ, আবার কিছুদিন বাদে নার্সিংহোম। সুখের সংসার গেল ভেঙে। ছেলেরা ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করে, বৌমারা বেঁকে বসেন। অতএব আলাদা হয়ে গেল সব। হেডমাস্টার মশাই রিটায়ার্ড হয়ে গেলেন এবং মেয়ে নিয়ে একাও হয়ে গেলেন। ডাকসাইটে

হেডমাস্টার হয়ে গেলেন এলেবেলে। "আমি মারা গেলে আমার মেয়ের কি হবে? কার কাছে রেখে যাব একে, কোথায় রেখে যাব? আমার বাড়ি আছে, টাকাপয়সা আছে, সমাজে কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু আমার অবর্তমানে আমার অসুস্থ মেয়েটির কি হবে?" — এই হলো হাহাকার। এমন আরো বহু প্রশ্ন আছে। এই হলো এক প্রান্তের ছবি। অন্য প্রান্তে কি দেখি?

মানসিক রোগ চিকিৎসাব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে নানাবিধ ফাঁক-ফোকর। রাষ্ট্রের তরফে ব্যবস্থাপনায় বা ব্যবস্থাপনাহীনতায়, চিকিৎসার দৃষ্টিভঙ্গিতে, পুনর্বাসনের ধারণায় অনেক 'নিছক কেতাবী' ব্যাপার আছে। মনোবৈজ্ঞানিকের, মনোচিকিৎসকের, গবেষকের ধ্যানধারণার সাথে ভুক্তভোগীদের বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের অনেক ফারাক আছে। মনোচিকিৎসায় বিশেষজ্ঞতার ভূমিকা ও কার্যকারিতার একটা সীমা ও সীমানা আছে। সেই সঙ্কীর্ণ চৌহদ্দির বাইরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমাজেরই বিচরণভূমি, সমাজেরই দায় বা দায়িত্বহীনতা। সমাজই পারে রোগীকে লালনপালন, মূলস্রোতে সামিলকরণ অথবা পরিবর্জনা-বিসর্জন।

এদিকে যতদিন যায় এলেবেলের ক্লিনিকে রোগীর চাপ তত বাড়ে, হাঁড়ির কহানীর বিনিময় ঘটে। যত বিচিত্র ধরণের সমস্যা ও বিভিন্ন পরিবেশাগত রোগীর ভিড়ে ক্লিনিক ভরে যায়, ততই 'এলেবেলে'-রা দেখেন মানসিক রোগ শুধু নয়, এটিকে ঘিরে কত ধরণের সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কত বহুমাত্রিক এই সব ঝামেলাবলী। সামগ্রিক জীবনবোধ ও দর্শন যেন এই সব সমস্যাবলী প্রসঙ্গে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জড বা প্রশ্নমুখর হতে থাকে। ভালোবাসা কি? দরদ কি? আপনজন কি? স্বার্থ কি? দোষারোপ কি? পাপ কি? লজ্জা কি? অবহেলা কি? নিরাপত্তাহীনতা কি? অধিকার কি? আধিপত্য কি? জিজ্ঞাসার পাহাড় জমে মনে।

ক্লিনিকে ডাক্তার বাবুদের ওষুধে, ইনজেকশনে, স্বেচ্ছাসেবীদের আশ্বাসবাণীর টনিকে কোনো কোনো অসুস্থ রোগী হয়তো বেশ কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। দেখা গেল, এর ফলে অন্যান্য নতুন সমস্যা উদ্ভূত হলো যেগুলো ওষুধ বা চিকিৎসাসংক্রান্ত নয়, নিতান্তই পারিবারিক, সামাজিক। নতুন বিবাহিতা মেয়েটি প্রথম বাচ্চা হবার পর মানসিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বাপের বাড়ির লোকজন মেয়েকে নিজেদের কাছে নিয়ে এসে এলেবেলেদের কাছে এল দেখাতে। রোগী যত সুস্থ হয়ে ওঠে, রোগী ও বাড়ির লোক তত বিষণ্ণ হয়ে ওঠে — কৈ, শ্বশুর বাড়ির লোকেরা যোগাযোগ করছে না তো? ওরা কি মেয়েকে আর ফিরিয়ে নেবে না? নানান দুর্ভাবনায় মেয়েটি সেরে ওঠার মুখে আবারো খারাপের দিকে যেতে থাকে।

দেখা গেল — ছেলে সেরে উঠছে। বাবা দীর্ঘদিন এরই সমস্যা নিয়ে অবসেস্‌ড (obsessed) এনগেজড (engaged) ছিলেন। যখন ছেলে ক্রমশ সেরে ওঠার মুখে তখন বাবাটির কিরকম ভ্যাবলামতো বেকার বেকার অবস্থা হয়ে যেতে থাকে। বাবাটির মানসিক সমস্যাবলী অবশেষে ফুটে বেরোতে লাগল। শুরু হয় বাবাটির চিকিৎসা।

আরো দেখা গেল — বাবাটি এম. ডি. পি.-র রোগী, আত্মহত্যার চেষ্টায় অতীতে বারকয়েক ব্যর্থকাম। আমাদের বিষণ্ণতারোধক ওষুধের মাত্রাধিক্যে ছেলের শ্বশুরবাড়ি গিয়ে এমন উদ্দাম উল্লাস হুল্লাট বাঁধিয়ে এলেন যে, ছেলেটি নড়বড়ে হয়ে ভুলভাল শুরু করল। তখন ধাতস্থ বাবাই ছেলেকে চিকিৎসা করাতে আনলেন। নিবিড় দৃষ্টিপাতে, অতীত ইতিহাসের অনুপুঙ্খে বোঝা গেল আসলে ছেলেরও মানসিক সমস্যা অনেকদিন থেকেই আছে। অথচ "তার যে এমন মাথার ব্যামো, কেউ কখনো জানত?"

মা নিয়ে আসেন মেয়েকে চিকিৎসা করাতে নিয়মিত। রোগের সাথে সম্পর্কিত ডিটেল দেন, আবার অসম্পর্কিত অনেক কথাই বলেন, নিজের দুরবস্থার কথা, কি করে চলে, কোথায় ছিলেন, কে আছে বাড়িতে — কখনও বক্‌বক্ করেন স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে, কখনও ডাক্তারবাবুর সাথেও। প্রশ্ন করেন — মেয়ের রোগটি কোনোদিনই কি সারবে না? এলেবেলেরা বোঝায় মেয়েটির রোগটি কি, এর লক্ষণ কি কি, এর ফলে অসুবিধা কি, কতদূর হতে পারে, কি করলে অসুবিধাগুলো কমতে পারে ইত্যাদি। শুনতে শুনতে প্রৌঢ়া কিছুটা বোঝেন, অনেকটাই তার মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়, চেষ্টা করেন, কি যেন ভাবেন। আচমকাই বলেন, "আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনাদের কথা শুনে-টুনে মনে হচ্ছে মেয়ের বাবাও যেন বরাবর একটু কি রকম। ওকে আপনাদের কাছে একবার নিয়ে আসব কি?"

ছেলেটি ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে দারুণ গ্রীষ্মেও বাড়ির উঠোনে কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। পাশের বাড়ির একজন মাসিমাকে বলে-কয়ে ছেলেটিকে পাঠাল চিকিৎসা করাতে। সে বেশ সুস্থ হয়ে ওঠে কয়েক মাসের মধ্যেই। চিকিৎসার আগে পাশের বাড়ির দাদাটির সাথে যাতায়াতের পথে দশবার দেখা হলে, দশবারই হাত পেতে বলত, 'একটা

বিড়ি হবে?' দাদাটি প্রতিবারই তা দিতেন কেননা তিনি বড় নরম মনের লোক। আর সেই দাদাই এখন মোটামুটি সুস্থ ছেলেটিকে দেখলে পালিয়ে বেড়ান। কারণ? কারণ, সে এখন আর বিড়ি চায় না বরং কাতর হয়ে বলে — 'দাদা যাহোক একটা চাকরি - বাক্‌রি দিন্ না!' চাইতো বিড়ি, তখন দেওয়া যেত, এখন সে সুস্থ। চায় চাকরি! কোথা থেকে দেবেন? তাই পালিয়ে বেড়ান। সেরে-ওঠা রোগীদের এ এক জেনুইন (genuine) সুস্থ আকুতি : 'ভালো তো হলাম। কি করব এখন? কিছু করে খেতে হবে তো? কাজ দেবেন?' এই আবেদন কখনো ডাক্তারবাবুর কাছে, কখনো স্বেচ্ছাসেবীদের কাছে।

পেশাদার ডাক্তারের কাছে এর উত্তর নেই। সেরে ওঠা রোগীরা যাতে পুনরাক্রান্ত না হয়, সমাজের মূল স্রোতে শামিল হয় — এসবের দায়ও নেই।

কিন্তু সামাজিক মানুষ হিসাবে, 'এলেবেলে'-ওয়ালা হিসাবে, ডা. খোলামেলা বা এলেবেলের অন্য ডাক্তারবাবুরা রোগীদের এইসব সমস্যায় চোখ-কান বুঁজে এড়িয়ে যেতে পারেন না, এড়িয়ে যেতে চানও না। কোথায় যেন, এমনকি তাদের চিকিৎসায় সেরে ওঠা রোগীর ভবিষ্যতের জন্যও দায়বদ্ধতা, টান বোধ করেন। তারা এও বোঝেন, এ-সব ব্যাপারে একা কারো পক্ষে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। মানসিক রোগ চিকিৎসার সাথে সাথে মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে চলতে থাকেন ডাক্তারবাবুরা। —'এলেবেলে' মিছিলে শামিল হন তাই।

বয়ে যাওয়া দেড় দশকে 'এলেবেলে'তে নিবিষ্ট-মনারা মানসিক রোগী ও পরিবারের জগতের নিষ্ঠুর, করুণ বাস্তব সত্যগুলির মুখোমুখি হতে হতে এই প্রত্যয়ে এসে পৌঁছেছেন যে, মানসিক রোগ সমস্যার বহুমাত্রিক ক্ষেত্রে ডাক্তারির ভূমিকা সামান্য কয়েক মাত্রাতেই সীমাবদ্ধ মাত্র। বিগ্‌ড়ে-যাওয়া ব্যক্তিটিকে ঠিকঠাক করার ক্ষেত্রে পরিবার, পরিবেশ, সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। আর সেখানে ছকে বাঁধা কোনো মুস্‌কিল আসান নেই। তাই যত দিন যায় এলেবেলের লোকেরা সকলের কথাই শোনে — রোগীর কথা, পরিবারের কথা, জিজ্ঞাসুর কথা, ভুয়োদর্শীর কথা, আনাড়ির কথা, বেয়াড়ার কথা শোনে আর বলে আর দেখে আর শেখে। আর কিছু সংকল্প, প্রকল্প দানা বাঁধোবাঁধো করে।

এলেবেলেদের মিছিল কিন্তু চলছে চলবে। মাঝে মধ্যেই হোঁচট্ খাচ্ছে। মাটি-কাদায় ঝড়ে-জলে কিম্ভুত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু থামার কোনো লক্ষণ নেই। এই মিছিলে কোনো সময় হুড়মুড়িয়ে অনেক লোক ভিড়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ বেরিয়েও যাচ্ছে, কেউ কেউ এই ঢোকে, এই বেরোয়, কেউ কেউ ক্লান্ত হয়ে জিরিয়ে বসে আবারো দৌড়ে মিছিলে শামিল হচ্ছে। লোক পালাচ্ছে - মিছিল কিন্তু চলমান! এ কি গড্ডলিকাপ্রবাহ নাকি নিছক গতিজাড্য (inertia or motion)?

একে একে মিছিলিয়াদের জিজ্ঞাসা করুন — দেখবেন নানা ভাষা, নানা মত। প্রশ্ন করুন তো, কেন এই চলা? কোথায় গন্তব্য? সহস্র উত্তর মালায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাবেন। মনে হবে যেন পথ চলাতেই এদের আনন্দ। কোথায়, কেন, কোন্ চুলোয় কিন্তু এ-সব যেন এদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক। যেন একসাথে চলছি — এই রোমাঞ্চই এদের পাথেয়, পথ্য এবং প্রাপ্তি। " আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ।"

আর কি এই চলিষ্ণুতার চালিকাশক্তি? —মোটিভেশন (motivation)? সম্ভবত প্রোগ্রামের পর প্রোগ্রামের অপমৃত্যুর পরেও মিছিলিয়াদের মনে নাছোড়বান্দা অবুঝ এক জেগে থাকা অবশেসন (obsession) — "ওরে মন! হবেই হবে।" কি হবে? — কেউ কি তা জানে!

অথচ কিসের আশায় আশায় যেন সবাই নিশিপালন করে, কেউ ঘুমিয়ে পড়ে না, চলে যাত্রী, চলে দিনরাত্রি, করে অমৃতলোক পথের অনুসন্ধান।

মানস **মনোরোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনদের একটি সংস্থা**

মানস ক্লিনিক : প্রতি শনিবার (বিকেল চারটে থেকে ছ-টা)
স্থান : মডার্ন স্কুল, 17B, মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী রোড, পার্ক সার্কাস, কলকাতা 700 017

এছাড়া কল্যাণীর পরের স্টেশন মদনপুর 'তেঘড়ি' গ্রামে মানসিক স্বাস্থ্য প্রকল্পেও রোগী দেখার বন্দোবস্ত আছে— বুধবার সকাল ন-টা থেকে বেলা এগারোটা।

চিঠিপত্রে যোগাযোগ :
অমল সোম, P 239, কিস্বার স্ট্রিট, কলকাতা 700 017

মানবিক অধিকার ও সাংবাদিকতা

সুভাষ গাঙ্গুলী

'মানবিক অধিকারের ওপর সাংবাদিকতা'-র জন্য দেওয়া পি.ইউ.সি.এল.-এর 16 তম বাৎসরিক পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণ

"The Forgotten decade : Archana Guha Case"–এই রচনাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক Forntier পত্রিকায় পর পর তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হয় (সেপ্টে. 21, সেপ্টে. 28 অক্টো. 5, 1996) এবং পরে তা PUCL নামে ভারতস্থিত এক বেসরকারি মানবিক অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত সংস্থার তরফ থেকে "মানবিক অধিকারের ওপর সাংবাদিকতা" এই শিরোনামায় এক বাৎসরিক সর্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করে। এঁরা এক এক বছরে এক এক রাজ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেন। এ-বছর (1997) এই অনুষ্ঠান হয়েছিল গুজরাট প্রদেশের আহ্‌মেদাবাদ শহরে। এই উপলক্ষ্যে দেওয়া ভাষণ এটি। ভাষণটি ইংরেজিতে দেওয়া হয়েছিল। তারই বাংলা অনুবাদ এটি। অর্চনা গুহ মামলায় অত্যাচারিতদের বিজয়কে স্বাগত জানিয়ে মামলার সংক্ষিপ্ত খবর এর আগে বি-ও-বিতে (জানু-মার্চ 1996)-তে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ একই ঘটনার সাথে সম্পর্কিত নীচের ভাষণটি এই কারণে ছাপা হলো যে, ঐ মামলা সম্পর্কে ও সাধারণভাবে মানবিক অধিকার রক্ষা আন্দোলন প্রসঙ্গে যে-সমস্ত তথ্য এবং মতামত এই ভাষণে উল্লিখিত তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে। এ-নিয়ে বিশদ আলোচনা হোক চাইছি আমরা। মতামত পেলে এই পত্রিকার পাতায় প্রকাশে আগ্রহী আমরা।

– স.ম.

যদিও "অর্চনা গুহ মামলা" এই শিরোনামায় প্রকাশিত আমার রচনাটি সাংবাদিকতার দরুন এই পুরস্কার পেয়েছে, তাবলে আমি কোনো পেশাদার সাংবাদিক নই। বলতে পারেন, এ ছিল আমার 'শখের' পরিশ্রম। পুলিশ হেফাজতে হিংস্রতার শিকার একটি পরিবার, সেই হিংস্রতার বিরুদ্ধে এই আদালতি লড়াই চালিয়ে ছিলেন। দু-দশক ধরে পরিচালিত সেই লড়াইয়ের সাথে আবেগের স্তরে আমিও জড়িয়ে গিয়েছিলাম। তারই ফলে ঐ লেখা। আদালত কক্ষের ভেতরে ও বাইরে পরিচালিত এই লড়াইয়ের খানিকটা অংশ আমি খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেদিক থেকে আমি নিজেকে বিশেষ সুবিধাভোগী মনে করি। আমার মনে হয়েছিল যে, যত অসম্পূর্ণভাবেই হোক না কেন, এই অভিজ্ঞতার কাহিনী অন্যদের কাছে পৌঁছে দেবার যোগ্য। ঐ রচনা তৈরি করতে গিয়ে বিচার-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমি যতটুকু শিখতে পেরেছি তাতে প্রাসঙ্গিকভাবে আমি নিজেই উপকৃত বোধ করেছি।

যে অতি সামান্য দেখবার চোখ এ-ব্যাপারে আমি অর্জন করতে পেরেছি, সৌমেন গুহ-র সাথে আলোচনা সেখানে আমাকে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে। যদিও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আইনী শিক্ষা তাঁর নেই, তথাপি তিনিই এই আইনী লড়াই-এর প্রধান নির্মাতা। এবং আমার ওই রচনাটি তৈরির সময় ও এই বক্তব্য তৈরি করার জন্যও, শ্রী গুহ-র হেফাজতে যে-সব দলিল-দস্তাবেজ, কাগজ, ও বইপত্র আছে সেগুলি আমার খুশিমতো ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল এবং ব্যবহার করেওছি। এ-জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে ঋণী। অবশ্য উক্ত ও অনুক্ত কোনো ভুলের দায়িত্ব সম্পূর্ণই আমার।

এই উপলক্ষ্যে আমি এই সংগ্রামের প্রধান যোদ্ধাদের অদম্য আত্মিক শক্তি, সহ্য ক্ষমতা ও নাগরিক সাহসের প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছি। এই যোদ্ধারা হলেন গুহ পরিবারের সদস্য শ্রী সৌমেন গুহ, তাঁর স্ত্রী শ্রীমতি লতিকা গুহ, এবং শ্রী গুহর ভগিনী শ্রমতী অর্চনা গুহ, যিনি পরবর্তীকালে একজন ডেনমার্কবাসী

ঠিকানা : 81, সহযোগ অ্যাপার্টমেন্টস,
ময়ুর বিহার, দিল্লী - 110091

নাগরিকের সাথে পরিণয় সূত্রে অন্য-পরিবারের সদস্যা। আসলে লড়াইটা তো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই ছিল। অবশেষে যারা অপরাধী প্রমাণ হলো সেই অভিযুক্ত পুলিশকর্মী ও অফিসারদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছে রাষ্ট্র শেষপর্যন্ত। শুধু তাই নয়— নাগরিক ও মানবিক অধিকারের প্রতি ঘোষিত আনুগত্যের জন্য যাঁদের গুহরা একসময় গভীরভাবে বিশ্বাস করেছিলেন তাদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছে এদের। দেশে ও বিদেশে যাঁরা ছোটো ও বড় আকারে এই লড়াইটাকে নানাভাবে মদত যুগয়েছেন তাঁদের প্রতিও আমি আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তাঁদের উদ্দেশেও, যাঁরা এই আইনী লড়াইয়ে বিজয়ের সংবাদকে বিপুল হর্ষের সাথে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন। নেপথ্য ও প্রকাশ্য এত সাহায্য ও সহযোগিতা সত্ত্বেও সৌমেন-লতিকা দম্পতিকে একাকিত্বে ভরা এক নির্জন পথ পরিক্রমা করতে হয়েছে এই দীর্ঘ সময়। আমার রচনায় সেটা আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি। বেদনাবহুল অজস্র ঘটনা ও কচিৎ কদাচিৎ আনন্দের কাহিনী পরোপুরিভাবে একমাত্র সেই যোদ্ধারা নিজেরাই বলতে পারবেন। আমি আমার যথাসাধ্য সামান্য কিছু বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র।

তিমির বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত *ফ্রন্টিয়ারে*-র প্রতিও আমি আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। এই পত্রিকার দৌলতেই এমন বড় একটি রচনা (যদিও বিষয়বস্তুর যা চরিত্র তার প্রতি সুবিচার করতে গেলে, আরো অনেক বড় পরিসর দরকার) দিনের আলোর মুখ দেখতে পেরেছিল। এটা অবশ্য *ফ্রন্টিয়ারে*-র পুরোনো ঐতিহ্যের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। সত্তরের দশকে যখন জেল হত্যা ও 'সংঘর্ষে মৃত্যু'র ঘটনা প্রথম আবির্ভূত হলো তুলনামূলকভাবে সুপরিচিত পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে *ফ্রন্টিয়ারে*-র কণ্ঠই সম্ভবত একমাত্র কণ্ঠ, যা মাসের পর মাস ধরে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে সরব থেকেছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার যে আদৌ খর্ব হচ্ছে সে-ব্যাপারে কোনো রকম সচেতনতা ততদিন অব্দি দেখায় নি বড় কাগজগুলি যতদিন পর্যন্ত না ইন্দিরা গান্ধীর আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার কোপ এসে পড়ল তাদের ঘাড়েও। যে-ঘটনা শেষপর্যন্ত "অর্চনা গুহ মামলার" জন্ম দিয়েছিল, সেটা যে সময়কালে ঘটেছিল তার খানিকটা স্বাদ ও গন্ধ দেবার জন্য সে-সময়ে *ফ্রন্টিয়ারে* (প্রয়াত সমর যেন তখন সম্পাদক ছিলেন) প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় থেকে খানিক উদ্‌ধৃতি দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

> "উর্দিধারী খুনিরা পশ্চিমবাংলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিভাবে এক রক্ত-তৃষ্ণা পুলিশবাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তরুণ-ও তাজা রক্তের পিপাসা মেটানোর জন্য কিভাবে একদল ড্রাকুলা প্রতিরাতে তাণ্ডব অভিযান চালাচ্ছে তার নতুন নতুন সাক্ষ্য প্রতিদিনই জমে উঠছে। তারা এমনকী গল্পে-পড়া দৈত্যের পদ্ধতিও নকল করছে। জানা গেছে, তারা আর এখন দরজার ঘন্টাও বাজায় না। বদলে তারা দেয়াল টপকে বাড়িতে ঢুকে তাদের বাছাই করা শিকারদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে অতর্কিতে। এই নাটকের শেষঅঙ্ক অভিনীত হয় রাস্তায়, কিংবা কয়েদি গাড়িতে বা থানায়। ঠাণ্ডা মাথায় হত্যার একঘেয়েপনাতে বৈচিত্র্য আনার জন্যই বোধ হয় এত বিচিত্র ব্যবস্থা।...
>
> *ফ্রন্টিয়ার*, নভেম্বর 18, 1970

দুঃখের হলেও এটা সত্য (হয় তো বর্তমান সময়ের বৈশিষ্টই তাই) যে চারিদিকের এত চাকচিক্য এবং মানবাধিকার নিয়ে আওয়াজ (যা আজ জনতার কণ্ঠ থেকে ক্ষমতাসীনেরাই নিজেদের কণ্ঠে তুলে নিয়েছে) সত্ত্বেও *ফ্রন্টিয়ারের* মতো পত্রিকা অর্থ ও পাঠক সংখ্যার দিক তেকে তীব্র সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যদিও গণতান্ত্রিক নীতির ধারক হিসেবে আজও তার আর্ন্তজাতিক সুনাম অম্লান, আমি আমার শ্রদ্ধেয় শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে আবেদন করব যে, তাঁরা যেন আর্থিক অনুদান বা নিয়মিত গ্রাহক হয়ে এই পত্রিকাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। ঠিকানা : 61 মট লেন, কলকাতা 700013, ফোন (033) 244-3201।

যদিও এই পুরস্কার আমাকেই দেওয়া হচ্ছে, আমি মনে করি সৌমেন গুহ ও *ফ্রন্টিয়ার* এই পুরস্কারের সমান অংশীদার। আমার ইচ্ছে অনুযায়ী ঘটনা ঘটলে আমি চাইতাম যে, তাঁরা এখানে উপস্থিত থাকুন ও আপনাদের সাথে তাঁদের পরিচয় করাতে পারলে আমি সম্মানিত বোধ করতাম। এটা আপনাদের জানাতে পেয়ে আমি সুখি যে, গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকারের জন্য বহুদশক জোড়া তাদের সংগ্রামের প্রতি আমার বিনম্র নিবেদন হিসেবে এই পুরস্কারের অর্থের অংশ তাঁরা অনুগ্রহ করে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন। মোট কুড়িহাজার টাকার পুরস্কারের দু-হাজার টাকা *ফ্রন্টিয়ারে* যাবে ও আঠারো হাজার টাকা শ্রী গুহ-র কাছে যাবে। শেষোক্ত জন আমায় জানিয়েছেন, টাকাটা তাঁরা ব্যবহার করবেন একটি পুস্তক প্রকাশার্থে। পুস্তকের নাম

পুলিশ হেফাজতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অর্চনা গুহ মামলা : সওয়াল, জবাব ও রায়, সৌমেন গুহ সম্পাদিত। *[Archana Guha case against Torture in Police custody — Arguments, Counter Arguments & Judgement at the Trial Court* — Edited by Sommen Guha]

আমার মতে নাগরিক/মানবিক অধিকার আন্দোলন ও ফৌজদারী আইনের ছাত্রদের কাছে এটা একটা মূল্যবান দলিল হবে। আমি একথা বলতে পারছি কারণ এগুলি যখন আদালত কক্ষে উপস্থিত করা হচ্ছিল—আমার স্বকর্ণে শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। যাঁরা সৌমেন গুহ-র সাথে যোগাযোগ করতে চান, তাঁদের জন্য তাঁর ঠিকানা : LD/5, কুষ্টিয়া হাউসিং এস্টেট, কুষ্টিয়া রোড, কলকাতা 700 039, ফোন (033) 343-8374।

এই উপলক্ষ্যে আমি কি আপনাদের কাছে আবেদন করতে পারি যে আপনারা অর্চনা গুহ মামলা সাফল্যের সাথে পরিচালনার জন্য উদার হস্তে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসুন? এই মামলা এখন সম্ভাব্য নিম্নতম আপিল কোর্টে (সেসনস কোর্ট) আছে। নিস্পত্তি হতে আরও বহুবছর লাগাতে পারে, তাই যে কোনো অনুদান উপরিল্লিখিত সৌমেন গুহ-র ঠিকানায় পাঠাতে পারেন।

আমার রচনাকে পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচনা করার জন্য আমি PUCL ও জুরি উভয়ের কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ এতে ঐ গণতান্ত্রিক আদর্শের পক্ষে সংগ্রামে রত দুই যোদ্ধার প্রস্তাবিত প্রকাশনার কাজে — যত সামান্য পরিমাণেই হোক সহায়ক হতে পারছি। আমার সন্তোষ লাভ করার অতিরিক্ত আর একটা কারণ এই যে, পুরস্কার পাওয়ার ফলে হয় তো রচনাটি আরও বৃহত্তর অংশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, যার ফলে মামলার শিক্ষা আরও একটু ব্যাপকভাবে ছড়াতে পারে, আর এই শেষ সম্ভাবনাটায় আমি বিশেষভাবে আগ্রহী। আমি আশা করি, এটুকু ভুলে না যাবার মতো বোধ আমার সব সময়েই থাকবে যে, বিবৃত বিবরণী কখনও যে-ঘটনা বা যে-ব্যক্তিত্বের বিষয় বিবরণীভুক্ত করা হচ্ছে তার গুরুত্বকে ছাপিয়ে যেতে পারে না।

অর্চনা গুহ মামলার সাথে আমার প্রত্যক্ষ পরিচিতি, এর আগে সত্তরের দশকে, যখন নাগরিক অধিকারের সপক্ষে কণ্ঠ এত ক্ষীণ ছিল যে, প্রায় শোনাই যেত না, তখন সেই অধিকার রক্ষা আন্দোলনের কর্মী হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা ও বর্তমানে প্রধানত একজন দর্শক হিসেবে পাশ থেকে যা দেখছি— এই তিনে মিলে আমার মনে কিছু ধারণা ও অনুভূতির জন্ম হয়েছে, যা আপনাদের অনুমতি নিয়ে আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে চাই। এতে আপনাদের নিজেদের মতেরও হয় তো প্রতিফলন থাকতে পারে। আবার না'-ও থাকতে পারে।

সত্তরের দশকের তুলনায় নাগরিক/মানবিক অধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এমন কয়েকটি নতুন দিক দেখা দিয়েছে, যা স্বাগত জানাবার মতো। আদালতের দিক থেকে এরকম একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে 'জনস্বার্থে মামলা' ধারণাটির জন্ম। এখানে যিনি বা যাঁদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তাঁদের অংশগ্রহণ অথবা অংশগ্রহণ-ব্যতিরেকেও এমন যে কোনো ব্যক্তি সুবচারের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন, যিনি ব্যক্তিগতভাবে ঐ অধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত নন। এমনকি একটি পোস্টকার্ডে যদি যে কোনো ব্যক্তি অন্য যে কোনো ব্যক্তির হয়ে কোনো অভিযোগ করে তো দেশের উচ্চতম আদালত তাকে রিট পিটিশন (Writ petition) হিসেবে বিবেচনা করতে পারে ও অনেক সময়েই তা করে। এর ফলে আইনী ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবিক অধিকার রক্ষায় উৎসাহী সংস্থা ও ব্যক্তিদের কাছে একটা নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে গেছে এবং এই নতুন সুযোগ ব্যবহার করে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিজয় ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে। এর আগে অন্যদের অধিকার রক্ষায় উৎসাহী ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সাহায্যের মাধ্যমেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হতেন, কারণ একমাত্র সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরই আইনী সুবিচার চাইবার অধিকার ছিল।

তাছাড়া জনমন ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত এই উভয় ক্ষেত্রেও মানবিক অধিকারের আওতা বা এলাকা অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে এবং জীবন, জীবিকা ও সাধারণভাবে মানুষের মঙ্গলের সাথে জড়িত নতুন নতুন দিক এর আওতার মধ্যে চলে আসছে। যেমন মোটামুটি আশীর দশক পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে হিংস্রতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রধানত রাজনৈতিক বন্দীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু এখন সবধরণের বন্দীদের জন্যই — (এমনকি তথাকথিত 'সমাজবিরোধী'রাও এর আওতার বাইরে পড়ছে না) পুলিশ হেফাজতে হিংস্রতার বিরুদ্ধে সুরাহা চাওয়া হচ্ছে। কম-বেশি আদালতগুলিও এ-ব্যাপারে এগিয়ে আসছে। আশীর দশক থেকেই অভিযোগের চরিত্র নিরপেক্ষভাবেই, বন্দীদের মর্যাদাপূর্ণ আবরণ পাবার অধিকারের সপক্ষে বিচারালয়ের আঙিনা থেকে গাদা গাদা নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে। অর্চনা গুহ মামলায় অপেশাদারী কৌশুলী সৌমেন গুহ

আদালতের যে-সব রায় নজির হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন ও আদালতের রায়ে অপরাধী প্রমাণে যে নজিরগুলিকে ব্যাপকভাবে উদ্‌ধৃত করেছিলেন, যে-সবের বেশিরভাগই এসেছে উপরে উল্লিখিত আশীর দশকের পরে দেওয়া উচ্চ আদালতের বিভিন্ন রায় থেকে। এই প্রসঙ্গে একটি অতি সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ রায়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। দশ বছর ধরে সুপ্রিম কোর্টে চলা এক আইনী লড়াইয়ের শেষে গত 18 ডিসেম্বর 1996 তারিখে কুলদীপ নায়ার ও ড. এ. এস. আনন্দ এই দুই বিচারপতি একটি রায় দিয়েছেন। এটা ছিল ভি. কে. বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর মামলা, পরে অন্য কয়েকটি রাজ্যকেও এই মামলায় জড়ানো হয়। শ্রী বসু 'লিগাল এইড সারভিস' নামে এক অলাভজনক সংস্থার সভাপতি। বন্দীদের সপক্ষে সুপ্রিম কোর্টের কাছে লেখা তাঁর এক চিঠিতে রিট পিটিশন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রায়ে হেফাজতে হিংস্রতার শিকার বন্দীদের রাষ্ট্রের কাছ থেকে ক্ষতি-পূরণ পাবার অধিকার স্বীকৃত হয়। এছাড়াও রায়ে এগারোটি নিয়ম বা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় যা গ্রেপ্তারকারী কর্তৃপক্ষকে প্রতিটি গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমহীন-ভাবে মেনে চলতে হবে। রায়ে আরও বলা হয় যে, এই নিয়মাবলী যেন দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে প্রচার করা হয় এবং সরকারের তরফ থেকে স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে ইস্তেহার হিসেবে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়।

এ হলো জমার দিকের হিসেব। খরচের দিকের কথা বলতে গেলে, যে-কারুরই এটা চোখে পড়বে যে মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা-র প্রতি রাষ্ট্রের ঔদাসীন্য অব্যাহতভাবে চলছে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তা আরও বেড়েছে : যদি না অবশ্য সেই লঙ্ঘনকারীরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই সংগ্রামরত হয়। প্রধানত বিদেশের উত্তমর্ণ রাষ্ট্রগুলির মনতুষ্টির জন্য লোক-দেখানো "মানবিক অধিকার কমিশন" তৈরি হয়েছে। কোনো কোনো ব্যতিক্রমী গুণাবলীর অধিকারী কিছু কিছু আধিকারিকদের সাহসী পদক্ষেপের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন উদাহরণও পাওয়া যায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আদালতী মতামতকে তোয়াক্কা না করে মানবিক অধিকার লঙ্ঘন অব্যাহতভাবে চলছে। যেমন হেফাজতে হিংস্রতা ও মৃত্যু ক্রমশ বাড়ছে। যখন এ-ধরণের নির্দিষ্ট ঘটনার ওপরে প্রশ্ন করা হয় তখন সরকারি মুখপাত্র অপরাধীদের সনাক্তকরণে তৎপরতা দেখানোর বদলে অবশ্যম্ভাবীভাবে পিছলে বেরিয়ে যাবার ছুতো খোঁজে। আর এ-ব্যাপারে রাজ্যস্তরে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আচরণে কর্তা "ডান" না "বাম" তাতে বিন্দুমাত্র ফারাক পড়ে না। আদালতী সিদ্ধান্তগুলি মেনে চলতে বাধ্য করাতে পারে এমন জন-আন্দোলনের চাপ যদিও রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের ওপর নেই তবুও এই ক্রমবর্দ্ধমান "জুডিসিয়াল অ্যাক্টিভিজম" ক্ষমতাসীনদের চঞ্চল করে তুলছে। কাজেই পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিচারব্যবস্থার ডানা ছেঁটে দেওয়া ও মানবিক অধিকার কর্মীদের নিরুৎসাহিত করার তৎপরতা শুরু হয়েছে। এটা খেয়াল করার মতো যে, এই ব্যাপারে মত নির্বিশেষে পার্লামেন্টে অংশগ্রহণকারী সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে গোপন বা প্রকাশ্য ঐক্যমত রয়েছে। এ-থেকে আবারও প্রমাণ হচ্ছে, ভারতের পেশাদার রাজনীতির লোকেদের—তা সে তারা যে দলেরই হোন না কেন — নাগরিক অধিকারের প্রতি কোনো আন্তরিক দায়বদ্ধতা নেই যদিও সেই অধিকারের জন্য বন্দনা গান গাইতে তাদের কোনো ক্লান্তি নেই। মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো নির্দিষ্ট ঘটনায় তারা তখনই সোরগোল তেলে। ভাগ্যচক্রের প্রতিকূল খেলায় তাদের নিজেদের অনুগামীদের কেউ এর শিকার হয়ে পড়ে বা এইরকম ঘটনা যখন বিরোধী গোষ্ঠীর সাথে হিসেব মেটানোর কাজে ব্যবহার করা যায়। অর্চনা গুহ মামলা বা রাজ্যে সাম্প্রতিক কালে হেফাজতে মৃত্যু-র ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার বা তার বিরোধী কংগ্রেসের আচরণ এই ধরণের মানসিকতার একটি অতি সাম্প্রতিক উদাহরণ, যার প্রতি আমি আমার রচনায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

কিন্তু এর চেয়েও যেটা অনেক বেশি উদ্বেগের সেটা হলো মানবিক অধিকার অন্দোলনের শিবিরের মধ্যেই পরিলক্ষিত কিছু প্রবণতা। মানবিক আধিকারের আদর্শে ঘোষিতভাবে নিবেদিত সংস্থাগুলি বিভিন্ন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত লড়ে যাবার বদলে নিজ নিজ "ভাবমূর্তি" গড়ে তোলার জন্য ক্রমশই বেশি বেশি করে উদ্যোগ নিচ্ছে। কাজেই ন্যায়বিচার অর্জনের প্রতিটি পদক্ষেপ যদি সংবাদ মাধ্যমের মনোযোগ আকর্ষণের উপযুক্ত না হয় তো একনিষ্ঠভাবে ন্যায়বিচারের পিছনে ছোটার বদলে এদের অনেকেই পাদপ্রদীপের আলোর দিকে ছোটাতেই বেশি উৎসাহ দেখাচ্ছেন। নিজেদের 'কীর্তির' ফর্দ সবার সামনে ঝুলিয়ে দিয়ে এঁরা যে মানবিক অধিকারের কত বড় অনুরাগী সেটা দুনিয়ার সামনে জাহির করার ব্যাপারে যতটা উৎসাহী — ততটা নিরুৎসাহী নিজেদের ব্যর্থতার ক্ষেত্রগুলিকে স্বীকার করতে এবং ততটাই অসহিষ্ণু অন্যদের সমালোচনার প্রতিও।

নিজেরা আক্রান্তদের পেছনে এসে দাঁড়ানোর বদলে আক্রান্তদের নিজেদের পিছনে ঠেলে দেওয়ার প্রবণতাই এঁদের মধ্যে বেশি দেখা যাচ্ছে। যেমন, অনেক সময়ই হেফাজতে হিংস্রতার ঘটনার ক্ষেত্রে আক্রান্তরা যে তাদের সহায়তায় মামলা দায়ের করেছে সেই ঘোষণা করার জন্য এরা প্রচুর ঘটা করে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকবেন। কিন্তু অচিরেই যখন ভারতীয় জটিল বিচারব্যবস্থার পাঁকের মধ্যে এই মামলাগুলি আটকে যায় — তখন আক্রান্ত পরিবারগুলিকে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। সুবিচার খোঁজার অপরাধে এই সব শোকাকুল পরিবারগুলি যখন হুমকির শিকার হয় বা এমনকি শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয় বা কখনও কখনও খুন পর্যন্ত হয়ে যায়, তখন যারা তাদেরকে দর্শনীয় সামগ্রী করে তুলেছিল তাদেরকে আর পাশে দেখা যায় না। এবং যে জনসাধারণের সামনে মস্ত লড়াইয়ের এক প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল তাঁরা এই প্রচেষ্টাগুলির মর্মান্তিক পরিণতির কথা জানতেও পারেন না। নির্যাতিতদের জন্য আন্তরিক উদ্বেগ ও মর্যাদার দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে এ-ধরণের নির্মম ঔদাসীন্য আসতে পারে না। মানবিক বেদনা নিয়ে বেসাতি করার পাটোয়ারী মানসিকতা থেকেই একমাত্র এরকম মনোভাব জন্মাতে পারে। আপাতবিরোধী শোনালেও এটা সত্য যে, দেশে ও বিদেশে মানবিক অধিকারের আদর্শের অগ্রগতির ফলেই এরকম মনোভাবের জন্ম হওয়া সম্ভব হয়েছে। আপাতভাবে মানবিক অধিকারের আওয়াজ একটা চালু রেওয়াজ বা কেতা হয়ে উঠেছে, যা থেকে কেউ কেউ বৃত্তি পর্যন্ত অর্জন করতে পারে বা এমনকি বিদেশে পর্যন্ত যেতে পারে। মানবধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে বা সেগুলিকে প্রচারিত করার পেছনে অনেক ক্ষেত্রে চমক সৃষ্টি করার প্রয়োজনটাই সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে। এমনকি বহুক্ষেত্রেই এই চমক সৃষ্টি করার খাতিরে সরল ও নির্ভেজাল সত্যের স্বার্থও বিসর্জন দেওয়া হয় ; অর্চনা গুহ মামলায় যেমন হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে, এই ব্যাপারে প্রকৃত পরিস্থিতিকে সোজাভাবে উপস্থিত করার প্রয়োজনবোধও আমার এ-রচনার পেছনে আর একটা অরিরিক্ত কারণ হিসাবে কাজ করেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে চমক্ সৃষ্টি করার প্রয়োজনে সত্যকে বলি দেওয়ার এই প্রবণতা থেকে সুপরিচিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংগঠনগুলিও মুক্ত নয়। অর্চনা গুহ মামলাতেই সে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

আর একটা ভুল ধারণা থেকেও মানবিক অধিকার কর্মীরা প্রায়ই ভুগে থাকেন। এই ধারণা অনুযায়ী সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বা শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি হলে সেটাকেই আন্দোলনের অগ্রগতির এক সূচক হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু এর ফলে সাধারণত যা হয় তা হলো, বিশেষত যদি এরকম বেয়াড়া ধরণের বড় সংগঠন যদি খুবই কেন্দ্রবদ্ধ হয় —সেক্ষেত্রে নানারকম কোন্দল, গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বও সংগঠনের মধ্যেই মাথাচাড়া দিতে থাকে রাজনৈতিক দলগুলির কায়দায় ক্ষমতা দখলের দৌড়ে। স্বচ্ছতা গোল্লায় যায়। জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার তো দূরস্থান, সংগঠনের মধ্যে গণতান্ত্রিক নীতি নিয়মকে কার্যত বিদায় সম্ভাষণ জানান হয়। চক্র ও চক্রান্তের আধিপত্য শুরু হয়। এই মনোভাবের থেকেই এই বেঠিক ধারণারও জন্ম হয় যে, যত বেশি লোক সুবিচার লাভে সাহায্যের জন্য মানবিক অধিকার সংস্থাটির কাছে ছুটে আসবে ততই তাকে সফল বলতে হবে।

কিন্তু আমার বিনম্র মত এই যে, সদস্য সংখ্যা ফুলেফেঁপে ওঠাটা মানবিক অধিকার আন্দোলনের অগ্রগতির কোনো সত্যিকারের সূচক নয়। প্রকৃত সূচক হলো এমন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, যাঁরা তাঁদের নাগরিক ও মানবিক অধিকার রক্ষার দাবিকে জোরের সাথে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজে থেকেই এগিয়ে আসবেন। মানবিক অধিকার সংস্থাগুলির অন্যতম কাজ হওয়া উচিত বৃহত্তর জনসমষ্টির মধ্যে—এই স্বাধীন ও স্বাবলম্বী মনোভাবের প্রসারে আনুকূল্য করা সংস্থাগুলির ওপর একান্ত নির্ভরশীলতাকে উৎসাহিত করা নয়। এবং নিজেদের ঢাক নিজেরা বাজানোর বদলে এমন সব উদাহরণকে জনসমক্ষে তুলে ধরার কাজকে সংস্থাগুলির বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। যেখানে ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে নাগরিকরা নিজেদের অধিকার ব্যক্ত বা প্রতিষ্ঠা করার কাজে নিজেরাই উদ্যোগ নিচ্ছেন। কেন্দ্রবদ্ধ এক ঢাউস সংগঠন এই কাজের পক্ষে সম্ভবত খুব উপযুক্ত নয়। বরং ঢিলেভাবে এক ফেডারেল কাঠামোর মধ্যে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক ও সহযোগিতা রেখে চলা স্বয়ংশাসিত বহু একক সংস্থার এক জাল গড়ে তোলার দিকে নজর দেওয়া দরকার। কোনো কেন্দ্র যদি থাকেও তবে তার কাজ হবে শুধু একক সংস্থাগুলির পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে সাহায্য করা ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা; তাছাড়া অন্য কোনো কাজই এই কেন্দ্রের থাকবে না। এই সব সংস্থাগুলির মধ্যে যে সব আলাপ-আলোচনা চলবে সেখানে কোনোরকম গোপনীয়তা কাম্য নয়। আভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য, কোন্দল সহ যা কিছু

সংগঠনের মধ্যে চলবে সে-সবই জনসাধারণের গোচরে থাকা দরকার। অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত সত্যের, "ভাবমূর্তির"র। কারণ সেটাই জনস্বার্থের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল।

আদালতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাঁরা অন্যায়ের প্রতিকার খুঁজবেন তাঁরা যাতে তাঁদের মামলার আইনী দিকে সক্রিয়ভাবে নজর দেন, সে ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহ দেওয়া দরকার। নাগরিকদের মধ্যে স্ব-নির্ভরতার বিকাশ, সহায়তা-দান কার্যক্রমেরই একটা অংশ। যেখানে তাঁদের আইনী সুরক্ষার দায়িত্ব পুরোপুরি নিজেরা নিতে পারছেন না, সেখানেও পেশাদারী আইনজীবীদের ওপর অন্ধ নির্ভরশীলতাকে নিরুৎসাহিত করা দরকার। এটা সামগ্রিকভাবে ব্যবহারজীবী সম্প্রদায়ের ওপর কোনো মন্তব্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, দাম্ভিকতায় না ভুগলে এবং মানবিক অধিকারের আদর্শে উৎসাহ থাকলে ব্যবহারজীবী সম্প্রদায়ের যে কোনো ব্যক্তি আইনী ব্যাপারে মক্কেলের উৎসাহ প্রদর্শনকে স্বাগতই জানাবেন। আমার রচনা দেখিয়ে দেবে, অন্তত পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকে এ-কথা বলা চলে যে, আইনজীবীর ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হলে তার জন্য কঠিন মূল্য দিতে হতে পারে। এবং আইনী পথে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে অর্চনা গুহ মামলা একটা অনুসরণযোগ্য নজির তৈরি করেছে। এই প্রসঙ্গে আমি বিদেশের আর এক ঐতিহাসিক নজিরেরও উল্লেখ করতে পারি। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে সত্তরের দশকের গোড়া পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের যে নাগরিক অধিকার আন্দোলন চলেছিল, তার অন্যতম এক দাবি ছিল পেশাদারী আইনজীবীদের সহায়তার পাশাপাশি, প্রয়োজনে যাতে নিজেরাই নিজেদের পক্ষে সওয়াল করতে পারেন তার আইনী অধিকার। রাচেল ম্যাগী, অধ্যাপিকা এঞ্জেলা ডেভিস ইত্যাদি কৃষ্ণাঙ্গ রাজনৈতিক বন্দীরা — যাদের বিরুদ্ধে খুন অপহরণ ইত্যাদি মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল—আদালতে বিস্তারিত ও যোগ্য সওয়ালের মাধ্যমে নির্দিষ্ট উদাহরণ সহ দেখিয়েছিলেন যে, কিভাবে কৃষ্ণাঙ্গ বন্দীদের সুরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পেশাদারী আইনজীবীরা বর্ণবিদ্বেষী অভিযোগকারী কর্তৃপক্ষের সাথে গোপন সহযোগিতার মাধ্যমে বন্দীদের আত্মরক্ষার সুযোগকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। হয়তো অবিকল একরকম নয়, তবে প্রায় অনুরূপ উদাহরণ এদেশেও একেবারে অপ্রাপ্য হবে, এমন নয়— অন্তত পশ্চিমবঙ্গে তো নয়ই।

এই প্রসঙ্গে আপনাদের সামনে বহু পুরোনো দিনের একটি ঘটনা উপস্থিত করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না, যেখানে আমরা দেখব, কিভাবে আমাদের দেশের মানুষ তাঁদের নাগরিক ও মানবিক অধিকারের প্রশ্নে নিজেরাই উদ্যোগী হয়েছিলেন। যদিও এই সম্ভাবনা খুবই প্রবল যে, এই অধিকার সম্পর্কিত শব্দগুলির সাথে তাঁদের কোনোই পরিচয় ছিল না।

1854 সালে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে মাদ্রাজে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল, কর আদায়ের ক্ষেত্রে নির্যাতনের ঘটনার তদন্ত করার জন্য। সেই সময়ে কর সংগ্রহ, বিচার ও প্রশাসন এই তিনেরই দায়িত্ব একই ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত থাকত। এটা খুব একটা অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় যে, ঐ কমিশনের রিপোর্টে অত্যাচারের পদ্ধতি সম্পর্কে যে-সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে তা আজও যা ঘটে চলেছে তার মতোই সমান নিষ্ঠুর। কিন্তু যেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে সেই গরুর গাড়ির যুগে, যখন ডাক যোগাযোগও হতো রানার-এর মাধ্যমে এবং নাগরিক অধিকারের বিষয়ে সচেতন করার জন্য কোনো গণমাধ্যমী প্রভাবও ছিল না বা সে-ব্যাপারে উপদেশ বিবরণের জন্য কোনো ঈশ্বরপ্রেরিত দূত অথবা অভিভাবকও ছিল না — হ্যাঁ, সেইরকম একটা সময়েও ওই কমিশনের কাছে 519টি অভিযোগ জমা পড়েছিল সেই ধরণের মানুষদের কাছ থেকে যাঁরা 300 থেকে 400 মাইল দূর দূর থেকে এসে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে এই অভিযোগগুলি জমা দিয়েছিলেন ও প্রয়োজনীয় সওয়াল জবাব করেছিলেন। এছাড়াও ডাকযোগে এসেছিল আরও 1440টি অভিযোগ। এবং এ-সবই ঘটেছিল মোট তিনমাসের মধ্যে। যে নানা পরামর্শ তাঁরা বিবেচনার জন্য কমিশনের কাছে রেখেছিলেন তার একটি হলো এই যে, পুলিশ-ব্যবস্থাকে "পুরোপুরিভাবে" (in to to) প্রত্যাহার করা হোক। তাঁদের মত, এতে জন-সাধারণের সুরক্ষা বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত না করেই একটা বড় রকম খরচের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে সরকারের অর্থভাণ্ডার।

আমি জানি না, জনসাধারণের স্বাধীন, স্ব-উদ্যোগী নাগরিক চেতনার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে। আজকে যদি তেমন নজির দেখতে না পাওয়া যায় তবে তার একটা বড় দায়িত্ব কী তাঁদের নয়, যাঁরা জনতাকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে মনে করেন ? আর যদি এখানে ওখানে তেমন দু-একটি উদাহরণও দেখা যায়, তবে সেই উদাহরণের বাণীকে সারা দেশময় ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ কি নাগরিক/মানবিক অধিকার সংস্থাগুলির কার্যক্রমে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়ার উপযুক্ত নয়?

প্রসঙ্গ : ঊনিশ-শ সাতানব্বই-এর বই মেলা

কলকাতা পুস্তক মেলা ঊনিশ-শ সাতানব্বই — দগ্ধ হলো আগুনে। বই পুড়েছে, ছবি পুড়েছে। প্যান্ডেল-প্যাভেলিয়ন পুড়েছে। পুড়েছে আস্থা। পুড়েছে বিশ্বাস। ছোটো বড় অনেক ব্যবসায়ীর কপাল পুড়েছে। রুজি-রোজগারের রসদ পুড়েছে অনেকের। রুজি-রোজগার ব্যবসা কোনওটার জন্যই নয় —এমন মানুষও জড়ো হয় বই মেলায় কিছু পত্রপত্রিকা আর চেয়েচিন্তে কিছু বই জোগাড় করে। সহমর্মী বন্ধুদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ ভাববিনিময়ের সুযোগ পাওয়া যাবে — এই আশায়। পুড়েছে তাদের অনেকের সেই সম্বলটুকুও। দুঃখে বেদনায় ক্ষোভে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন, ভেঙে পড়েছেন অনেকে। প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নানান ভাষায়, নানান কায়দায়।

কলকাতার এই বই মেলা যবে শুরু হয়েছিল — ছিল একরকম। এখন অন্যরকম। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সব কালেই ছিল। এখন বড্ড বেআব্রু সবকিছু। এক কালের উদ্যোক্তাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন নতুন অনেকেই। অনেক স্বার্থের মেলবন্ধন আজকের 'বই মেলা'। বই মেলার ছাইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে এই সত্য (!) নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি হলো অনেক। জানা গেল অনেক অজানা কথা। অনেক স্বার্থ-সম্বন্ধের কথা।

মাথা বাঁচাতে, মান বাঁচাতে এর ওর ঘাড়ে দোষ চাপাতে এরই ফাঁকে শুরু হয়েছিল মেলা ফের শুরুর প্রয়াস। এই নিয়ে উঠেছে বিতর্ক। দগ্ধ ভ্রষ্ট এই বই মেলায় ফের যাওয়া কি না — এই নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। অনেকেই উচিত মনে করেন নি ফিরে যাওয়া। তীব্র ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছেন উদ্যোক্তাদের আহবান। যান নি ফিরে ছাইয়ের গাদার ওপর দাঁড়িয়ে সংস্কৃতি বেচতে। আবার কেউ কেউ গেছেনও। যা কিছু সম্বল জোগাড় করে। ব্যবসার কারণে। অথবা অন্য কারণেও হয়তো। 'বি ও বি'-ও গিয়েছিল ফিরে —ওই ভগ্ন বই মেলায়।

কেন গেছে — খুব খুটিয়ে-খাতিয়ে ভেবে দেখা হয়েছে এমন নয়। কেন যাবে না — খুব গুছিয়ে ভেবে উঠতে পারে নি বলেই হয়তো। দোনামনা করতে করতে চলে গেছে। আসলে — 'ভগ্ন মেলা' কি 'জ্যান্ত-মেলা' সবখানেতেই বি ও বি-র অস্তিত্ব এতই অকিঞ্চিৎকর যে, সে অস্তিত্বকে নিয়ে কি করবে অনেকসময়ই ভেবে উঠতে পারে না বি ও বি —তার এলোমেলো আচরণে এর স্বাক্ষর সর্বক্ষণই মিলছে। ফলে কেন মেলায় ফিরে যাওয়া — তা নিয়ে সাফাইতে যাচ্ছে না। অথবা 'না-যাওয়াদের' তরফে তোলা অভিযোগ-অনুযোগের উত্তর দিতেও ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারছে না। শুধু এটুকু জানাচ্ছে যে, 'না-গেছেন যাঁরা' তাঁদের ক্ষোভ ও দুঃখের কারণ অনুমান অনুভব করতে পারছে বি ও বি।

ওই ভাঙা মেলায় অনেকের মতো বি ও বিও একটি লিফলেট বিলি করেছিল। তাতে আবেদন ছিল একটি। বলা হয়েছিল — কলকাতা বই মেলা সম্পর্কে আপনাদের মতামত-মনোভাব, আশা-হতাশা, আকো-অনুভূতির কথা আমাদের লিখে জানান। আমরা ভাগ করে নিই তাদের অনুভব বি ও বি-র পাঠকদের সাথে। উৎসাহিত বোধ করছি — এই আবেদনে সাড়া দিয়েছেন দু-চারজন। —নানান ভাষাতে। হুবহু প্রকাশ করা হলো সে ভাবনাগুলো। —এরপরেও চাইলে কেউ পাঠাতে পারেন আপনাদের 'বই মেলা' ঘিরে কথা। 'বি ও বি' প্রকাশ করবে তা। — *স.ম.*

স্মৃতি, সুখের আবার বেদনারও

তপন বিদ

সেদিন সোমবার, ফেব্রুয়ারির তিন তারিখ। কলকাতা থেকে প্রায় দুশো কিলোমিটার দূরে আমার গ্রামে আমি। বিকেলে যখন নদীর ধারের মাঠটাতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় পায়চারি করছি, ঠাণ্ডা বই মেলা তখন পুড়ছে। দাবানল জ্বলছে ময়দানে স্টলে-স্টলে। গরম হাওয়া, আগুন আর ধোঁয়া। না, আমি টের পাই নি। পাব কি করে! আমি তখন পায়চারি করছি আর ভাবছি, কাল মঙ্গলবার যাব বই মেলায়। অথচ রাশি রাশি বই তখন ভয়ংকর আগুনের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। পরদিন মঙ্গলবার, ট্রেনে আসতে আসতে খবরটা জানলাম। কাগজে দেখলাম—বিধ্বংসী

অগ্নিকাণ্ডে কলকাতা বই মেলা পুড়ে ছাই —। তেতো হয়ে গেল মনটা। দেখলাম, লণ্ড ভণ্ড বইমেলার ছবি কাগজের পাতায় পাতায়। বুকের মধ্যে হাহাকার টের পেলাম। অজস্র প্রশ্ন ভিড় করল সঙ্গে সঙ্গে ; কি করে হলো, কেন হলো! ছবি দেখছি আর প্রতিবেদন পড়ছি — আর মনে পড়ছে গত বছরের বই মেলার স্মৃতি। আমার দেখা কলকাতার প্রথম বই মেলা।

গাঁয়ের মানুষ আমি। পৌষ মেলা, গাজনের মেলা, রাসের মেলা এ-সব অনেক দেখেছি। কিন্তু বই মেলা, নাঃ দেখি নি। কর্মসূত্রে কলকাতায় এসে বই মেলার সাথে প্রথম পরিচয় আমার। এই তো গত বছর। প্রথম আলাপেই মুগ্ধ হলাম। চারিদিকে বই, বই আর বই। সব নতুন। অপূর্ব সব স্টল। কী সুন্দর করে সাজানো, গোছানো। নিয়মের চোখ রাঙানি নেই, যে কোনো বইয়ে হাত দেওয়া যায়, পড়া যায়, দেখা যায়। কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছিলাম পছন্দসই কয়েকটা বই কিনব বলে। কিন্তু স্টলগুলোতে ঘুরতে ঘুরতে মনে হচ্ছিল, অনেক বই কিনি, আরো কিনি। সাধ হার মানল সাধ্যের কাছে। তবে ছাড়ি নি, সাথীদের কাছ থেকে ধার করে আমার পছন্দসই বইগুলো কিনলাম। আর বই নেড়ে-চেড়ে, কিছু বই ওইখানেই দেখে, পড়ে পড়ে আকাঙ্ক্ষা মেটালাম। প্রাণভরে ঘুরলাম। দেখলাম, বই মেলা শুধু কতকগুলো বই বিক্রির দোকান আর বই কেনার ক্রেতাদের ভিড় নয়; লেখক, প্রকাশক আর পাঠকদের মেলবন্ধন ঘটেছে এই মেলায়। এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগের একটা দারুণ উন্মাদনা আছে, টের পেলাম মনে মনে। বন্ধুদের একজন বলল, ওতো ছবি ভালোবাসে, চলো 'মমার্তে' যাই .....। আমার কাণ্ডারী ওরা। ঢুকলাম ওদের পেছনে পেছনে। শিল্পী আর শিল্পকর্মের মেলা। ভেতরটা টগ্‌বগিয়ে উঠল। নড়তে ইচ্ছে করছিল না। কি করব। ওদের তাড়ায় আবার মানুষের স্রোতে গা ভাসালাম। এমন সময় আমি বললাম, চা খাব, খাবে তোমরা? সবাই দেখি আমার কথায় সায় দিল। কিন্তু চায়ের দামটা শুনে ইচ্ছেটা নষ্ট হয়ে গেল। তিন টাকায় এক ভাঁড়। বন্ধুদের একজন বলল, কোই বাত নেহি। খুঁজে দেখি চলো, কম দামে পেয়ে যাব। চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু পাওয়া গেল না। অগত্যা ঐ খেলাম। আবার ঢুকে পড়লাম বইসমুদ্রে, সাঁতার আর সাঁতার। একসময় ঘুরতে ঘুরতে খিদে পেয়ে গেল। ঢুকেছিলাম বিকেলে, তখনও দিনের গায়ে সাঁটা ছিল সূর্যের আলো। নিশি পাওয়া মানুষের মতো বই-এর ঘ্রাণ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কখন যে রাত নেমেছে বুঝতে পারি নি। খেতে গেলাম বটে কিন্তু গিয়ে দেখলাম, আরো কিছু পয়সা জুড়লে ওই দামে একটা বই কেনা হয়ে যাবে। খাওয়া হলো না। বন্ধুরা আমায় গেঁইয়া বলে খেপাল। আরো এক ভাঁড় গরম চা ঢেলে দিলাম উদ্যত ফণা খিদের মাথায়। ব্যাস সব ঠাণ্ডা। পেটটা খালি ছিল বটে কিন্তু মনটা কানায় কানায় ভরে গেল। মেলা মানেই ক্রেতা আর বিক্রেতা। মিলতে গেলেই পয়সা চাই। ফেল কড়ি মাখ তেল। বই মেলাও মেলা, এখানেও অর্থের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। তবে তা কেবল রূঢ় জাগতিক নয়, কর্কশ মহাজনীয় নয়। লক্ষ্মী যেন এখানে সরস্বতীর দৃঢ় শাসনে সংযত বরং ব্রীড়াবনত। অর্থনীতির খটমট নারকোলের খোল ছাড়িয়ে এনে দেয় তৃপ্তির সাদা শাঁস। ...

হঠাৎ লোকজন হুড়মুড় করে নামতে থাকায় সম্বিত ফিরে আসে, ট্রেন হাওড়ার প্লাটফর্মে ঢুকে পড়েছে। অফিসে এসেই সিদ্ধান্ত নিলাম। অফিস শেষ করে গেলাম সেই বই-এর মহেঞ্জোদাড়োতে। পায়ের নিচে কালো ছাই-এর কাদা। বাতাসে পোড়া গন্ধ। শিউরে উঠল শরীরটা। হাজার হাজার বই-এর অসহায় দগ্ধ শরীরের ভস্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। চারিদিকে কালো মৃত্যুর ছোবলের চিহ্ন। এখানে ওখানে কয়েকটা শকুনের মতো আধপোড়া খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন দেখি নির্বাক দৃষ্টি নিয়ে, অস্থির হাতে ঘেঁটে চলেছে ছাই ; শেষ হয়ে যাওয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রিয়জনের শরীর খোঁজার মতো করে। নাকি তিল তিল করে ডাগর হয়ে ওঠা ২৩ বছরের বইমেলার লুণ্ঠিত ইজ্জত খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা! জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল, তোমরা কে গো, কি খুঁজছ? বোবা দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। বুঝলাম কলিঙ্গ যুদ্ধের বিজয়ী নায়ক অশোকের অন্তরাত্মা কেন মৃত্যুর বীভৎসতায় কেঁদে উঠেছিল। কিন্তু আমার কান্না যে পাষাণ হয়ে জমে যাচ্ছে বুকে, সেই সব অমূল্য সৃষ্টি, যা ছিল কত পরিশ্রমের, কত সাধনার — তার কথা ভেবে, স্বল্প কিন্তু সর্বস্ব নিয়ে যে-সব প্রকাশক কিংবা মণ্ডপশিল্পী সাজিয়ে তুলেছিলেন এই মেলা প্রাঙ্গণ তাদের চরম ক্ষতির কথা ভেবে। ওই তো সেই পুকুর। পায়ে পায়ে এলাম। এখানেই দাঁড়িয়ে ছিল ট্রয়ের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা অকেজো কাঠের ঘোড়ার মতো দমকল বাহিনীর একটি গাড়ি, ২৯ জানুয়ারি থেকে। সংকট-মুহূর্তে কার অভিশাপে কর্ণের রথের চাকার মতো বসে গেল এর যান্ত্রিকক্ষমতা। অভিশাপ ছিল কর্তব্যে অবহেলার, দায়বদ্ধতার অভাববোধের। যার জন্য মুখ পুড়ল বাঙালির। এতদিন যে সুনামের সুবাস ছিল

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, তা আজ লজ্জার, অকর্মণ্যতার পোড়াগন্ধে ভরা। গাফিলতি শুধু দমকলের নয়, পুলিশের, বিদ্যুৎদপ্তর আর বই মেলা কর্তৃপক্ষেরও। তাঁরা জানেন, সচেতন মানুষের কাছে এই মেলা কত গর্বের, কত আনন্দের। কি বিশাল ঢল নামে এই ময়দানে। টাটকা অক্ষর শেখা বাচ্চা থেকে আশীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধ সবাই আসেন এখানে। তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ কি নিদারুণ দায়িত্বের সঙ্গে সব পণ্ড করে দিলেন—তা আজ ইতিহাস। পরিষ্কার পরিকল্পনামাফিক খাবার দোকানগুলো ক্লান্ত মানুষগুলোকে ঠকিয়েছে, দেড়-দুগুণ দাম নিয়ে। কর্তৃপক্ষ জানেন না? কেন? না কি দেখে না দেখার ভাণ করেছেন সবাই। এই অসাধু ব্যবসায়ীদের সাথে সন্ধি কার স্বার্থে, যদি প্রশ্ন রাখি? যার জন্য কোটি কোটি টাকার বই পুড়ল, পুড়ল সম্মান আর প্রাণ দিলেন এক বৃদ্ধ জ্ঞানতাপস যতীন শীল। এই ক্ষতির শূন্যতা কি দিয়ে ভরাট করবেন কর্তৃপক্ষ? কোনো কোনো সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ, মেলা প্রাঙ্গণের ধুলো নিবারক স্প্রে-ই নাকি এই খাণ্ডবদাহনের অর্জুন। তাই যদি হয়, আমার সবিনয় প্রশ্ন — অচেনা অজানা ঐ বস্তুটি প্রয়োগের আগে কি একবার অন্তত যাচাই করে নেওয়া উচিত ছিল না — সাপ না ব্যাঙ? তাহলে ঐ ফ্রাঙ্কেনস্টাইন এই ধ্বংসটা করতে পারত না। দরকার কি ছিল, আমাদের চুল, ভুরু, কাপড় না হয় সাদা ধুলোয় ভরে যেত কিন্তু এমন করে তো চারিদিক কালো করে মহাকাল নেমে আসত না। আট তারিখ থেকে আবার বই মেলা বসল। কিন্তু ধ্বংসের ঐ চিতার ওপর কি বাসর শয্যা রচনা করা যায়। ওখানে যে এখনো সানাই-এ শিবরঞ্জনী বাজছে।

□□

বইমেলা ৯৭

নিশীথ চৌধুরী

---

২৯. ১. ৯৭ উদ্বোধন

এদিক ওদিক ঠুকুস ঠাকুস
এদিক ওদিক ঠক ঠক,
উদ্বোধনে বইমেলাতে
বড্ড বেশি বক বক।

৩০. ১. ৯৭ হকার

লিটল ম্যাগের
হকার তোরা
মেলার মাঝে কি?
ইঁদুরছানা
বাইরে যা না
কেলেঙ্কারি — ছিঃ!

১. ২. ৯৭ হাঁউ মাঁউ খাঁউ

বেনফিস ফিস
ভিড় গিসগিস
চাউমিন মিন চাউ,
মোগলাই লাই
চাই চাই চাই
হাঁউ মাঁউ মাঁউ খাঁউ।
বই টই টই
হই চই চই
কই কই কই কই?
খাই খাই খাই
তাই তাই তাই
আয় চইচই সই।

৩. ২. ৯৭ আগুন নাকি?

রাজা বলে — আগুন নাকি?
আচ্ছা দেখি থাম্
মন্ত্রী বলে — ব্যস্ত আমি
আছে অনেক কাম।
উজির বলে — সত্যি হুঁজুর
আগুন জ্বলে ওই,
সান্ত্রী বলে — একটু দূরে
ঘাপ্‌টি মেরে রই।

৩. ২. ৯৭ আগুন জ্বলে

আগুন জ্বলে
চতুর্দিকে
আকাশ কালো ধোঁয়া,
পুড়ছে মেলা
বিকাল বেলা
দগ্ধ স্মৃতির ছোঁয়া।

৮. ২. ৯৭ নতুন মেলা

ভস্ম থেকে উঠ্‌লো জেগে
নতুন মেলা তাই কি?
আগের মতো প্রাণের ছোঁয়া
হৃদয় খুঁজে পাই কি ?

□□

বই মেলার আগুন

মানসকুমার চিনি (কবি)

আমার স্বপ্নের বই মেলা ৯৭ পুড়ে যেতে দেখলাম যখন সন্ধ্যা আরও ঘন হবে বলে ভাবছে। দুশো বারো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আমি বই মেলার উত্তাপ নিতে যাই। ঘাসের ওপর যে ছবিগুলো আঁকা হয়, যে কবিতার পাতা উড়তে থাকে তাকে আমি উদ্ধার করতে যাই অথচ ৩ ফেব্রুয়ারি আমার স্বপ্নের বই মেলাকে বাঁচাতে পারি নি। মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম আমার ফুসফুস পুড়ে গেল, আমার কবিতার অক্ষর পুড়ে গেল।

বাতাসে আগুন, আগুনের ধোঁয়ায় অসংখ্য পাণ্ডুলিপির মৃত্যু হয়। এক একটি বই এক একটি মানুষের সমান মূল্য। বইগুলোর মধ্যে যে মানবিকতার কথা লেখা ছিল, যে ভালোবাসার কথা লেখা ছিল, যে শিল্পীর তুলির টান ছিল, যে সময়ের অক্ষর জ্বলে উঠেছিল তা কি আর ফিরে পাব : পৃথিবীর সব ভালোবাসা বুঝি একদিন ছাই হয়। অসংখ্য বই-এর মৃত্যুদৃশ্য দেখে ঘুম আসে, ঘুম যায়। স্বপ্ন জমা হয়, স্বপ্ন মিথ্যে হয়। কাদের চূড়ান্ত অবহেলায় এরকম দৃশ্য তৈরি হলো। এমন গণচিতা আমি পুনর্বার দেখতে চাই না। আগুন কত বিধ্বংসী। আগুন কত নিষ্ঠুর, আবার আগুন কত শুদ্ধ তবু আমার বই মেলা বেঁচে থাকবে কবিতা, ছবি ও গল্পে।

'অগ্নিশুদ্ধি'

রীনা দত্ত

আগুনই পারে সব বিভেদ মুছে দিতে,
আগুনই পারে তুমুল দাহনে সব অনাচার,
মিথ্যে বৈভব পরিশুদ্ধ করতে —
আগুনই জানে জমাট অন্ধকার দূর করে
রক্তিম ঊষার আবাহন।
তাই শীতের বিকেলে জুড়ে
কল্লোলিনী মহানগরীর বুকে
অন্তরেখায় মিশে গেছে
নির্বিশেষ কালো ছাই —
পোড়া অক্ষর পরিবার, সমাজ সংসার।
প্রলয় জলসায় উদ্দাম -
যেন, বড়ে গোলামের জীবন্ত দীপক রাগ,
নির্বাপণ যন্ত্রের আগেই —
ঝরঝর নেমেছে সহস্র চোখের বাঁধভাঙা জোয়ার।
অগ্নিকুণ্ডের উচ্চ ফারেনহাইটের মাঝেও
অন্তরের অন্তঃস্তলে
কাঁপন ধরানো অদ্ভুত শৈত্য।
তবু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে
ধ্বংসের কুয়াশা ছিন্ন করে
আবার জেগেছে নতুন ভোর
বেজেছে সৃষ্টির বাঁশি —
পুনরায় নব ইন্দ্রপ্রস্থের সূচনা।
মানবতার সত্যের জয়গান গেয়ে
ঝলসানো ক্ষতচিহ্নে ঢেকে রেখে
অমলিন হেসে উঠেছে
নতুন প্রচ্ছদে
চিরন্তন, চিরআপন অক্ষরমালা।

বই মেলা সাতানব্বই বই মেলা সাতানব্বই বই মেলা সাতানব্বই বই মেলা

তৃতীয় পর্ব

বিষয় : পরিবেশ

দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার উর্ধ্বে পরিবেশ কোনো বিমূর্ত বিষয় নয়। মানুষের সৃষ্টি-স্থিতি-কৃতি সবই পরিবেশ নির্ভর। লয়ও বোধহয় পরিবেশ ধ্বংসে। সমাজ-সংস্কৃতি-জীবিকা সবকিছুই আজ পরিবেশ দূষণের প্রচ্ছায়া উপচ্ছায়া কবলিত। বিজ্ঞান-কারিগরি পরিবেশ দূষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। দূষণ-রোধেও বিজ্ঞান-কারিগরিকেই হাতিয়ার হয়ে উঠতে হবে ঠিকই, কিন্তু পরিবেশমুখী একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে তা সম্ভব হবে না বলেই মনে হয়। এমনই এক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধানের উদ্যোগ — বিষয় : পরিবেশ। যে কেউ এ-বিভাগে প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাতে পারেন — কমবেশি দু-হাজার শব্দের মধ্যে। চিঠিপত্রে মতামত জানান। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ওপর খবরাখবর, টীকা, সমীক্ষা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে।

— স. ম.

পরিবেশ-আইনকানুন : নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য

[আইনের পাল্কি চড়ে আসে স্বপ্নসম্ভবার লাশ,
আসে ভক্ষক, কখনওবা নতুন রক্ষকের ছদ্মবেশে,
পাইক পেয়াদা কোর্ট কাছারি উর্দি, কালো গাউন
দালাল পরিবেশবিদ, বিজ্ঞানী, সার্কাসের ক্লাউন।
— হুজুর ধর্মাবতার, আমার লাশটাকে বাঁচান হুজুর
বিজ্ঞাপনের শাড়ির মোড়ক থেকে আমি বেঁচে উঠতে চাই
একদিন, কোনোদিন, পৃথিবীর কবরের পাশে
নতুন শিশুকে বুকে নিয়ে।]

বিশেষজ্ঞতার ঘেরাটোপ

অরুণকে মনে আছে আপনাদের? অরুণের প্রশ্ন দিয়েই শুরু হয়েছিল 'বিষয় : পরিবেশ'। এবং অরুণেরই 'পরামর্শ' মতো বিগত দশটি সংখ্যায় দুটি পর্বে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে পরিবেশ দূষণের বিজ্ঞান-কারিগরির মৌলিক কিছু কিছু দিক। অরুণ তীব্রভাবে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিল যে পরিবেশ ও তার দূষণকে একটা গভীর জটিল বৈজ্ঞানিক তথা টেকনিক্যাল বিষয় হিসেবে অভিহিত করে বিশেষজ্ঞতার ঘেরাটোপে বন্দী করে রাখার প্রচেষ্টা চলে। সাধারণ মানুষের ভূমিকা তথা সচেতনতা নিয়ে ভুরি ভুরি বাগবিস্তার হলেও, বিশেষজ্ঞরাই সব কিছু জানেন বোঝেন এই মনোভাব বা আচরণে কোথাও ফাটল ধরে না। অথচ সাধারণ মানুষই দূষণের শিকার হলো সর্বাগ্রে। অরুণ তার জোরালো মত ঘোষণা করেছিল — বিশেষজ্ঞতার শক্ত খোলসটা ভাঙতে হবে; পরিবেশ ও দূষণের বিজ্ঞান-কারিগরির মূল বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। বিশেষজ্ঞতাকে অতিক্রম করার জন্যই বিশেষ পন্থা-প্রকরণ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা কাটাতে হবে।

অরুণের বক্তব্য যে যথেষ্ট সারগর্ভী, তাতে সন্দেহ নেই। এক হিসেবে ভারতে সাধারণ-মানুষই শাসক। নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁরাই তো সরকারি নীতির, কাজের মূল্যায়ন করেন। দূষণ, শিল্পায়ন, প্রগতি এসবও ঐ একই প্রক্রিয়ায় অঙ্গীভূত।

কিন্তু উপরিউক্ত অর্থে সাধারণ মানুষের মধ্যে — বিশেষত শিক্ষিত অংশে — পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার কাজটা সহজ নয়, ছোটোও নয়। বহুমুখী, ব্যাপক ও লাগাতার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই অগ্রগতি সম্ভব। ভারতের মতো বহুভাষাভাষী দেশে মানুষের কাছে পৌঁছনোর জন্য ইংরিজির ঘেরাটোপটিকেও খানিকটা অন্তত সরিয়ে দিতে হবে।

সাধারণ মানুষ, এমনকি শিক্ষিত সব মানুষ, সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল দিক জেনে বুঝে ফেলবেন— বিশেষজ্ঞের আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না — এমন কথা কেউ বললেও তা আখেরে অবাস্তবই। অন্যদিকে বিশেষজ্ঞদেরও যে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ভঙ্গি-ভাষা চাহিদা একটু-আধটু উপলব্ধি করা প্রয়োজন — একথাও অনস্বীকার্য। বিশেষজ্ঞতার ঘেরাটোপ সরাতে বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ-মানুষের পারস্পারিক আস্থা-বিশ্বাস এবং এমনকি যৌথ উদ্যোগও একান্ত জরুরি।

আইন-কানুনও বিশেষজ্ঞ কবলিত

বিশেষজ্ঞতার আবরণ যে শুধু বিজ্ঞান ও কারিগরি কেন্দ্রিক, তা মোটেই নয়। পরিবেশ ও দূষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনকানুন ও সেগুলির প্রয়োগ নিয়েও তৈরি হয়েছে বিশেষজ্ঞতার আর এক ঘেরাটোপ। এক্ষেত্রেও আইনী বিশেষজ্ঞরা সাধারণত বন্দী থাকেন তাঁদের বিশেষ জ্ঞানের ও চর্চার প্রকোষ্ঠে। কদাচিৎ কোনো বিশেষজ্ঞ তাঁর উচ্চাসন থেকে অবতরণ করে 'পরিবেশ ও আইন' বিষয়ে সাধারণের উদ্দেশ্যে কিছু বলার প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেন। এমনিতেই এঁরা সংখ্যায় নগণ্য, ভারতীয় স্থানীয় ভাষায় কথা বলেন বা লেখেন, তেমন বিশেষজ্ঞ রীতিমতো বিরল। ... কিন্তু এই সামান্য প্রচেষ্টাও কাঙ্ক্ষিত সুফল আনতে পারছে না, শুধু একটা ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলাচ্ছে মাত্র। কারণ, মনে হয়, দুপক্ষের কেউ কারও ভাষা বা প্রয়োজন সম্যক বোঝেন না।

এবং তাই, এক্ষেত্রেও, বিশেষজ্ঞ ও অ-বিশেষজ্ঞের মধ্যে একটা ন্যূনতম মেলবন্ধন গড়ে উঠবে, এই আশা নিয়ে এই পর্বে আমরা পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রধান প্রধান ভারতীয় আইনগুলির পর্যালোচনার চেষ্টা করব। উদ্দেশ্য থাকবে পরিবেশ ও দূষণের প্রশ্নে নাগরিকের আইনী অধিকারই বা কোথায় কতখানি, কর্তব্যই বা কী? সাধারণত, এ-ধরণের আলোচনায় অধিকারের প্রশ্নটিকেই তুলে ধরা হয়, কিন্তু কর্তব্য ছাড়া কি কোনো অধিকার ভোগ করা যায়?

পরিবেশ-আইন : পটভূমি

আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো নাগরিকের জীবন-জীবিকা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, অধিকার-স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা, জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করা, অপরাপর মানুষের ওপর কোনো বিশেষ ক্রিয়াকলাপের কুফলের সম্ভাবনা দূর করা বা কমানো — অর্থাৎ এক সার্বিক সমাজের ওপরেই আইনের ভিত্তি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার না-করেও বিভিন্ন আইন বা নীতি-নির্দেশ পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেকদিন থেকেই অনেক নীতি-নিয়মে চালু আছে। উদাহরণ হিসেবে সর্বাগ্রে বলতে হয় সংবিধানের কথা।

সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে নাগরিকের সাধারণ অধিকার ভারতীয় সংবিধান স্বীকৃত ; সাম্প্রতিক সংযোজনে তা আরও স্পষ্ট ও জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়েছে। বিশুদ্ধ জল বাতাস ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নাগরিকের মৌলিক অধিকার। আবার পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নয়ন এবং অরণ্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ যে নাগরিক কর্তব্য তারও উল্লেখ আছে ভারতীয় সংবিধানে।

কিন্তু সাধারণভাবে এসব নিয়ে তেমন কোনো মাথাব্যথা আমাদের ছিল না। মানুষের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন — অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদির এত অপ্রতুলতা যে পরিবেশ আমাদের চিন্তায় ঠাঁই করে নিতে পারে নি। অবশ্য সম্প্রতি, ক্ষীণভাবে হলেও এ-উপলব্ধি ঘটছে যে, ভাত-কাপড়ের সমস্যা মিটিয়ে তারপর পরিবেশ নিয়ে ভাবা যাবে — এ চিন্তা ঠিক নয়। বরং দুটো একই সঙ্গে সামলাতে হবে। কেননা ভুখা পেটে দূষণের প্রভাব বেশি ভয়ঙ্কর এবং পরিবেশের বিনষ্টি ভাত-কাপড়ের সংস্থানের মূলেই আঘাত করে।

এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরেও পরিবেশ সচেতনতা তেমন প্রবল ছিল না। বিভিন্ন নির্দিষ্ট বিষয়ে (যেমন, পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) কিছু কিছু আন্তর্জাতিক চুক্তি বিভিন্ন সময়ে সম্পাদিত হয়েছে যাতে পরোক্ষে পরিবেশ গুরুত্ব পেয়েছে ; কিন্তু না ছিল সেগুলির ব্যাপকতা, না ছিল রূপায়ণের জোরালো তাগিদ বা আন্তরিকতা। . . . . . .1962-তে শ্রীমতি র‍্যাচেল কারসনের *Silent Spring* বইটি একটি প্রবল ভূমিকা পালন করল। পরিবেশ যে কোনো কাল্পনিক বা অলস ভাবনার আশ্রয় নয়, তা প্রথম ভালোভাবে উপলব্ধি করানো *Silent Spring*, অশুভ বিশেষজ্ঞ মহলের বাইরে— বিজ্ঞানী-বিশেজ্ঞরাও প্রভাবিত হলেন—পরিবেশ দূষণের নানাদিকের গবেষণায় জোয়ার এল। 1972-এ সুইডেনের স্টকহোমে বসল প্রথম আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মিলন। সেখানে উপস্থিত সমস্ত দেশই একটি আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারপত্রের প্রয়োজন স্বীকার করে ছাব্বিশটি নীতি সম্বলিত ঘোষণাপত্র অনুমোদন করল। এরই অন্যতম একটি নীতিতে বলা হয়েছে—পরিবেশ সংরক্ষণ ও জাতীয় উন্নয়ন পরস্পর-বিরোধী নয়। বস্তুত, সেই প্রথম আন্তর্জাতিকভাবে পরোক্ষে স্বীকৃত হলো যে, শিল্পায়ন ও উন্নয়ন সমার্থক নাও হতে পারে। এবং শিল্পায়নকে প্রকৃত উন্নয়নমুখী হতে হলে পরিবেশের ক্ষতি না করেই তা করতে হবে। এবং করা সম্ভবও। এই আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্রের ফলশ্রুতি হিসেবে দেশে দেশে পরিবেশ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট আইন-প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু শুধু আইন প্রণয়ন করলেই হয় না, আইন প্রয়োগের জন্য বিশেষ বাস্তব

পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন নির্দিষ্ট নিয়মকানুনও (রুলস) তৈরি করতে হয়, আইন-প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো সরকারি দপ্তর বা সংস্থার কতটুকু এক্তিয়ার তাও স্পষ্ট করার দরকার হয়। প্রয়োজনে নতুন সংগঠন-সংস্থা তৈরিও করতে হয়। নতুন আইন রূপায়ণের ক্ষেত্রে পুরনো কোনো কোনো আইনের অসম্পূর্ণতা অসঙ্গতিও দূর করার প্রয়োজন দেখা দেয়। মূল বা প্রধান আইনকে ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে নতুন সহায়ক আইনও অনেক সময় জরুরি হয়ে পড়ে।

পরিবেশ ও দূষণ সম্পর্কিত ভারতীয় আইন

স্টকহোম সম্মিলনের ঘোষণাপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে ভারত সেইসব অগ্রণী দেশের অন্যতম, যে-সব দেশে বেশ তাড়াতাড়িই সুনির্দিষ্ট আইনকানুন এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। 1974 সালেই ভারতে তৈরি হলো কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক ও দপ্তর এবং প্রথম আইন — জল (দূষণরোধ ও নিয়ন্ত্রণের) আইন। প্রধান রূপায়ণকারী সংস্থা হিসেবে জন্ম হলো কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ; রাজ্যে রাজ্যেও সংগঠিত হতে থাকল রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সমূহ।

ভারতীয় পটভূমিতে সবচেয়ে পুরনো যে আইনটি সরাসরি পরিবেশ সম্পর্কিত বলে ধরা যায়, সম্ভবত সেটি হলো বেঙ্গল স্মোক ন্যুইস্যান্স অ্যাক্ট (1905) । অন্য প্রদেশেও পরে এই ধরণের প্রাদেশিক আইন চালু হয়েছিল। এখন সেগুলির সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। বেঙ্গল স্মোক ন্যুইসান্স অ্যাক্ট 1978-এ সংশোধিত হলো। এবং তারপরও বায়ুদূষণ নিয়ে সামগ্রিক আইন প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হলো। এল বায়ু (দূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, 1981; এইসব আইন কার্যকর করার জন্য তৈরি হলো প্রয়োজনীয় রুলস্‌ও।

কিন্তু এইসব উদ্যোগ ও ব্যবস্থা যে নিশ্ছিদ্র ছিল না তার মর্মান্তিক প্রমাণ মিলল অচিরেই। ভয়াবহ ভূপাল দুর্ঘটনা (ডিসেম্বর 1984) দুটো বিষয়কে স্পষ্ট করল — প্রচলিত আইনের অপ্রতুলতা এবং সেগুলোর প্রয়োগে শিথিলতা। সাধারণ ভারতবাসীর জীবন যে কতখানি অসহয়তায় ভরা তার উলঙ্গ প্রকাশের পাশাপাশি, এটাও বোঝা গেল যে, ঘাতকরা কতখানি সুরক্ষিত!

আইনের প্রয়োগ-শৈথিল্যের চেয়ে অপ্রতুলতাই যে ভূপাল বিপর্যয়ের বড় নিয়ামক ছিল এ-কথা স্বীকার না করলে বোধহয় সত্যের অনেকটা অপলাপই করা হয়। প্রকৃতপক্ষে কলকারখানার আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার অভাব যে সরাসরি পরিবেশ দূষণের উৎস, শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে কঠোরতম সাবধানতা অবলম্বন এগুলি নিশ্চিত না হলে যে পরিবেশ সুরক্ষাও নিশ্চিত করা যায় না — সেদিকে যথেষ্ট সতর্ক ছিলাম না আমরা। অবশ্য শুধু আমরাই বা কেন, উন্নত অনেক দেশেও এই অভাবটা পুরোমাত্রাই ছিল। একের পর এক ঘটে চলেছিল মর্মান্তিক ও তাৎপর্যপূর্ণ সব দুর্ঘটনা — ইংলন্ডের ফ্লিক্সবরোতে রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণ, আগুন ও ধ্বংস (1974) ; ইতালির সেভেসোতে বিস্ফোরণে ছড়িয়ে পড়া বিষ (1976) ; আমেরিকার থ্রি মাইল আইল্যান্ডে পরমাণু চুল্লীর দুর্ঘটনা (1979) ইত্যাদি। ইওরোপে তখন জোর কদমে চলছে বিপজ্জনক শিল্প, প্রক্রিয়া ও পদার্থ নিয়ন্ত্রণের নিয়মবিধি রচনার আয়োজন. .. . .। কিন্তু তার প্রভাব পড়ার আগেই ঘটে গেল মেক্সিকো-র এল পি জি-র আগুন আর ঠিক বারোদিন পরে ভূপাল। আবারও ঘটল পরমাণু চুল্লীতে বিপর্যয় — এবার রাশিয়ার চের্নোবিলে (1986)। অপেক্ষাকৃত দ্রুততার সঙ্গেই প্রণীত হলো ভারতীয় পরিবেশ সুরক্ষা আইন (Environment Protection Act, 1986) এবং তাতে গুরুত্ব পেল বিপজ্জনক শিল্প ও রাসায়নিক পদার্থের সর্বস্তরে নিয়ন্ত্রণের নীতি। পরবর্তী কয়েকবছর ধরে একে একে তৈরি হলো পরিবেশ আইনের অধীনে বিভিন্ন রুলস। এবং এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুরনো কারখানা আইন (1948) হলো সংশোধিত ও সম্প্রসারিত (1987)।

সহায়ক কিছু কিছু আইনও হয় নতুন করে রচিত হয়েছে অথবা সংশোধিত হয়েছে যেমন, বন সংরক্ষণ আইন (1980)। দূষণ সংক্রান্ত আইনের সহযোগী গুরুত্বপূর্ণ একটি আইন জন-দায় বীমা আইন (Public Liability Insurance Act, 1991)। . . . .এই ধারা চলতেই থাকবে। কিন্তু এসবের ফলে কতটুকু বেড়েছে জন-নিরাপত্তার সম্ভাবনা, কতটুকু কমার সম্ভবনা দুর্ঘটনা বা দূষণ?

শুধু আইন নয়, চাই যথাযথ প্রয়োগ

আইন এবং নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করাই শেষ কথা নয়, এমনকি

কোনো কথাই নয়, যদি না সেগুলির সুচিন্তিত প্রয়োগ হয়।

আইন রূপায়ণকারী কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা এবং নাগরিক উদ্যোগের মেলবন্ধনের ভূমিকা এক্ষেত্রে অপরিসীম। নাগরিক সচেতনতা, সমর্থন ও উৎসাহ না থাকলে কর্তৃত্বকারী সংস্থা বা ব্যক্তির উৎসাহ শুধু স্তিমিতই হয় না, হয়তো বিপথগামীও হবার সুযোগ পায়। অপরদিকে সরকার বা কর্তৃপক্ষের দিক থেকে উদাসীনতা, অবহেলা, অসততা প্রকাশ পেলে সচেতন নাগরিকও এগিয়ে যেতে ভরসা পান না। এক দুষ্টচক্রের আবর্তে আইনের বাণী পরিহাসে পরিণত হয়। ভারতের মতো অসাম্য, অশিক্ষার দেশে এ-এক মারাত্মক ব্যাধি।

ভারতে বার বার কিছু কিছু যুক্তি সামনে এসেছে যা আমাদের সুষ্ঠু পরিবেশ নীতি গ্রহণ ও রূপায়ণে বাধার সৃষ্টি করে গেছে। এ-জাতীয় যুক্তিবিন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য : ভারত প্রাকৃতিক মানব সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও শিল্পবিপ্লবের সুফল ও সমৃদ্ধি আমাদের ঘটে নি। পশ্চিম দেশগুলি শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছে। এবং এতদিন তারা মোটামুটি অনিয়ন্ত্রিতভাবেই ঘটিয়ে গেছে পরিবেশ দূষণ। আজ অবস্থা আয়ত্বের বাইরে যাবার উপক্রম হওয়ায়, পরিবেশ সুরক্ষার ধুয়ো তুলে তারা স্তব্ধ করে দিতে চাইছে আমাদের উন্নয়ন, আমাদের শিল্পায়ন, আমাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। তারা শুধু আমাদের ভাতে মারতেই উদ্যোগী নয়— এমনকি পরিবেশ দূষণের প্রধান দায়ভাগী হিসেবেও চিহ্নিত করতে চায় আমাদেরকেই! এ একটা চক্রান্ত এবং এতে কান না দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে দ্রুতগতিতে। পরিবেশ নিয়ে আমাদের অত চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই, শিল্পায়নে এতটুকু শিথিলতাও আমাদের দেখালে চলবে না। এ-ধরণের যুক্তির কিছু কিছু দিক সম্পূর্ণ অসার বা উপেক্ষার না হলেও সামগ্রিকভাবে এই বোধে আচ্ছন্ন বা অন্ধ হলে তা হবে নিতান্তই আত্মঘাতী।

পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আইনগুলির সমস্ত দিক কার্যকরভাবে লাগু না হবার আর একটি কারণ, এক্তিয়ার নিয়ে অস্পষ্টতা বা ঠোকাঠুকি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মোটর ভিহিকিল্‌স্ অ্যাক্ট প্রয়োগের দায়িত্ব দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। অথচ এর সুষ্ঠু প্রয়োগের ওপরই নির্ভর করে বায়ুদূষণের অবস্থা (বিশেষত শহরাঞ্চলের) বা বিপজ্জনক পদার্থবাহী মোটরযানের দুর্ঘটনা কবলিত হওয়া বা না হওয়া। এসব বিষয়ে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে দপ্তরে দপ্তরে বিরোধের কথা আমাদের সকলেরই জানা।

পরিবেশের সামগ্রিক লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রক তথা দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়কারী একটি শক্তিশালী শীর্ষ সংগঠনের খুবই দরকার ছিল। যে সরকার শিল্পায়নের দ্রুততার জন্য বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে 'এক জানালা' নীতি কার্যকর করতে পারেন। সেই সরকারই পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে এরকম কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, এটাই আশ্চর্যের। অবশ্য সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি পরিবেশের ব্যাপারে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সমন্বয়কারী কমিটি গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। শিল্পস্থাপনে সহায়তা করা বা উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি শিল্প অনুমোদনের সময়েই যদি শিল্পোদ্যোগীকে জানিয়ে দেওয়া যেত, দূষণ ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত কি কি আইন ও নিয়মকানুন তাদের মানতে হবে, কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে—তবে সবদিক থেকেই তা হতো মঙ্গলের। কিন্তু এ-ব্যাপারেও আমাদের শৈথিল্য বা উদাসীনতা নজিরবিহীন। অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ-রকম একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। (Provisions Under Various Acts/ Rules for abatement of Pollution, Dept. of Env., Govt. of W. B., Jan, 1997)। আশার কথা।

আইনজীবী এম. সি. মেহতার আনা গঙ্গাদূষণ সংক্রান্ত মামলার দৌলতে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ বেঞ্চ এবং তারই নির্দেশে তৈরি বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টের 'গ্রীন' বেঞ্চগুলিই সমন্বয়কারী শীর্ষসংগঠনের অভাব আপাতত খানিকটা পূরণ করছে ; পরিবেশ সংশ্লিষ্ট নাগরিক অধিকার রক্ষার লড়াইতেও তা নতুন করে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়েছে।

শিল্প-শ্রমিক ও কর্মচারী তথা ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকাও এ-প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এখনও পর্যন্ত, মোটের ওপর ট্রেড ইউনিয়নগুলি পরিবেশ আন্দোলনকে অনেকটা সন্দেহের চোখেই দেখে থাকে। দূষণের দায়ে কারখানা/সংস্থা বন্ধ হলে শ্রমিক-কর্মীদের রুটি-রুজিও বন্ধ হয়ে যাবে — তাঁদের এ-আশঙ্কা অসঙ্গতও নয়, অমূলকও নয়। অনতি-অতীতে সুপ্রিম কোর্ট একের পর এক কারখানা/সংস্থা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেও, শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবিকার সুরক্ষার কোনো কথাই সে আদেশে ঠাঁই পেত না। পশ্চিমবঙ্গেরই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'নাগরিক মঞ্চের' উদ্যোগে ছটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে (CITU বাদে) সুপ্রিম কোর্টের কাছে শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার দরবার

(1995) খানিকটা স্বস্তি আনতে পেরেছে। দূষণের দায়ে কলকারখানা বন্ধ হলে নিরপরাধ শ্রমিকের পেটে হাত কেন পড়বে — এ-প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্ট ইতিবাচক সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন রায় বা নির্দেশ দিয়েছেন যাতে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও রুটি বেমালুম ভুলে যাবার অভ্যাসে আঘাত পড়েছে। শিশু শ্রমিকদের বিপজ্জনক কাজে লাগানোর প্রবণতাতেও সুপ্রিম কোর্টের লাগাম লাগানোর প্রয়াস প্রশংসনীয়। আর 'নাগরিক মঞ্চ' শুধু সমর্থনই দাবি করে না, তাঁরা একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে অগ্রসর হয়েছেন। যা আইন-বিশেষজ্ঞ এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে সচেতন মানুষের সেতুবন্ধের কাজ করছে, অন্যরাও অনুপ্রাণিত হচ্ছেন।

পরিবেশ-আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যে পরস্পর বিরোধী নয় বরং পরিপূরক এই সচেতনতার ব্যাপ্তি না ঘটলে সার্বিক উন্নতির আশা কম। শ্রমিক-কর্মীদের স্বাস্থ্য ও জীবিকার নিরাপত্তার লক্ষ্যে একগুচ্ছ আইন আছে। এইসব আইনে এমন অনেক সংস্থান আছে যেগুলি রূপায়ণের ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যথাযথ ভূমিকা নিলে শিল্পের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষিত হবার নিশ্চিতি বাড়বে — কমবে দুর্ঘটনা ও দূষণ, বাঁচবে পরিবেশ।

এ প্রসঙ্গে শেষ একটি কথা—আইন প্রণীত হলেও ব্যবহারিক রুল্‌স্ ঘোষিত না হওয়ায় যেমন আইনের প্রয়োগ হয় নি তেমনি সব কিছু থাকলেও পরিকাঠামো তৈরির জন্য বা দৈনন্দিন কার্যনির্বাহের জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দ হয় নি — এমন পরিস্থিতিও ভারতে বিরল নয়। আর তাই, ভারতীয় পরিবেশ আইন অনেক সময় থেকেও নেই। সচেতন নাগরিক এবং মরমী বিশেষজ্ঞের যৌথ ভূমিকায় এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি অচিরে বন্ধ হবে — এ আশা দুরাশা মনে হচ্ছে না।

রবীন মজুমদার

পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে

ঐতিহাসিক 'অর্চনা গুহ মামলা' সংগ্রামের বিশবছর পূর্তি ২০ অগাস্ট ১৯৯৭ প্রকাশিত হচ্ছে :

BATTLE OF 'ARCHANA GUHA CASE'

Arguments, Counter-Arguments and Judgement at the Trial Court

Edited by Saumen Guha

[Human Justice in India Publication]

অফসেটে ছাপা ৩৫০ পৃষ্ঠার বেশি এ গ্রন্থের সাধারণ দাম ২০০ টাকা। প্রকাশের পূর্বে ১০০ টাকার সাহায্যে গ্রন্থটির গ্রাহক হওয়া যাবে।

উজ্জ্বল অন্ধকার

(প্রথম পর্ব : ১৭ জুলাই ১৯৭৪—২২ জুন ১৯৭৭)

সৌমেন গুহ

অফসেটে ছাপা ৫৫০ পৃষ্ঠার বেশি এ গ্রন্থের সাধারণ দাম ১৫০ টাকা। প্রকাশের পূর্বে ১০০ টাকার সাহায্যে গ্রন্থটির গ্রাহক হওয়া যাবে।

ফোকিমেজ প্রকাশনা

এল/ডি-৫ কুষ্ঠিয়া (অবন্তিকা) আবাসন, কলকাতা ৭০০ ০৩৯

জনস্বার্থ মামলায় বিব্রত জনগণের সেবকগণ

রবীন চক্রবর্তী

সমাজবিরোধীদের কাছে 'আইন' বড় বালাই। — হবেই তো। এতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু দেশসেবক (!) মাননীয় মন্ত্রীদেরও যদি তেমনটাই মনে হয় — তাহলে? এদেশের যে নতুন একটি নিয়ম দেশে-বিদেশে হাজারো মানুষের প্রশংসা কুড়োল সেটাই যদি রাজনীতির কারবারীদের মনে হয় ঝঞ্ঝাটের — তাহলে? তাহলে দুঃখের সঙ্গে হলেও ধরে নিতেই হয়—গলদ বিসমিল্লায়।

আদালতে বিচার চাইবার জন্য একটি শর্ত ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিজেকে আবেদন করতে হতো বিচার চেয়ে। তাঁর হয়ে অন্য কেউ সেটি করতে পারত না। এর ফলে বহু অন্যায়-অবিচার নীরবে নিঃভৃতে মাথা খুঁড়ে মরত। অবিচার যার ওপর হচ্ছে — অনেক সময় তাঁর পক্ষে আদালত অবধি পৌঁছনোই সম্ভব হতো না। অনেক কারণেই সম্ভব না হতে পারে। আর আমাদের মতো দেশে তো বেশিরভাগের পক্ষেই সেটা সম্ভব নয়। দারিদ্র, অজ্ঞতা, ভীতি — নানা কারণেই সম্ভব নয়। এই বিষয়টি সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করেছিলেন এদেশের উচ্চ উপ-ন্যায়ালয়ের কিছু বিচারপতি। যার প্রধান হোতা ছিলেন এককালের প্রধান বিচারপতি শ্রী পি এন ভগবতী। সংশোধন করিয়েছিলেন আবেদনের শর্তটি — সত্তরের দশকের শেষের দিকে।

পুরনো নিয়ম সংশোধন করে বলা হয়েছিল যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিজেকেই যে বিচার চেয়ে আবেদন করতে হবে এমন নয়। তাঁর হয়ে যে কেউ জানাতে পারবেন অভিজ্ঞতা। এমন-কি, এই মর্মে পোস্টকার্ডে লিখিত আবেদনপত্রও আদালতে বিবেচনা হতে পারে।

সে এক ঐতিহাসিক ঘোষণা। মনে থাকতে পারে অনেকের, এর ফলে কত শত মামলা দায়ের হয়েছিল আদালতে। কত নির্মম অত্যাচার অবিচার অন্যায়ের কাহিনী উন্মোচিত হয়েছে দেশবাসীর কাছে। কত ঐতিহাসিক রায় বেরিয়ে এসেছে আদালত কক্ষ থেকে। আর এই অন্যায়ের বেশিরভাগটাই চলে আসছিল সমাজের দুর্বলতর অংশের মানুষের ওপর। এই মামলাগুলিই ক্রমে আখ্যা পায় 'জনস্বার্থ মামলা' বা 'পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন' নামে। ক্রমে এই মামলার বিস্তৃতি ঘটে অন্যক্ষেত্রেও। যার অন্যতম হলো তথাকথিত ওপরমহলের দুর্নীতি ও অপকর্মের বিরুদ্ধে মামলা। —সে-জন্যই উদ্বিগ্ন কিছু লোকজন। — তাদের প্রতিনিধিরা। —মন্ত্রী-আমলা অনেকেই।

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে আজ যে, সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রায় কোনো রাস্তাই খোলা নেই সাধারণ মানুষের কাছে। বিশেষ করে তাদের, যাদের নেই কোনো ক্ষমতা—কেন্দ্রের সাথে গাঁটছড়া। এমন একটি সময়ে আদালতের এই ভূমিকা সেই মানুষদের খানিকটা নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। আদালত কোনো প্রমোদকুঞ্জ নয় যে, মানুষ সখ করে মধু খেতে যাবে সেখানে। যে পরিমাণ হেনস্থা হতে হয় আদালতের খানাখন্দে—ভুক্তভোগী যিনি জানেন ভালো করেই। তথাপি সেই আদালত-ই আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের শেষ ভরসাস্থল!

এই সুযোগটুকুও কেড়ে নিতে উদ্যত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। এ-ব্যাপারে সব দল প্রায় এককাট্টা। প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে আদালতের পিণ্ডি চট্‌কাচ্ছেন। মুখে মুখে ফিরছে এক কথা — এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাচ্ছে আদালত। বিচারকদের বিদ্রূপ করছেন নানান কায়দায়। সাম্প্রতিককালের রায়গুলি সম্পর্কে বিদ্রূপ করে বলছেন, এগুলো হলো — 'জুডিশিয়াল অ্যাক্‌টিভিটিস্', তাই আদালতকে বে-লাইন থেকে ফেরাতে এবং জনগণের বেয়াদপি রুখতে বার করেছেন ফিকির। বিচার প্রার্থনার পদ্ধতিতে নতুন কিছু শর্ত যোগ করছেন। সংসদের আগামী অধিবেশনে এই মর্মে পেশ করা হবে একটি সংশোধনী

বিল। এর মধ্যে সরকারের পতন হলে অসুবিধে কিছু হওয়ার নয়। কারণ এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক দল মতপ্রকাশ করেছে বলে জানা নেই। তাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন সরকার বদল হলেও 'জনগণের ইচ্ছা' নামক 'স্বপ্ন' রূপায়ণে উদ্যোগের অভাব হয় না — এক্ষেত্রেও তাই হবে, সন্দেহ নেই।

এমন একটি সময়ে এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যা নানান কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই মুহূর্তে 'জনস্বার্থ মামলা'য় নাস্তানাবুদ হতে চলেছেন অনেকেই। ক্ষমতাশালী লোকজন তাঁরা, নেহাত অর্থ ও ক্ষমতার জোরে নানান কায়দায় দেরি করিয়ে চলেছেন বিচারপর্ব, সেই সব ক্ষমতাবানদের কাছ থেকে চাপ আসছে বোঝাই যায়। তাই এত আগ্রহ সংশোধনী আনার। সংশোধনী গৃহীত হলে চালু মামলার ক্ষেত্রেও যাতে এটা প্রয়োজ্য হয় তার ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে।

সংশোধনীটি কি? সরাসরি পুরনো নিয়মে ফিরে যাওয়াটা অসুবিধের। তার প্রতিক্রিয়া ভালো হবে না — জানেন এ-কথা। ফলে অন্য রাস্তা নিয়েছেন। হুট্‌হাট কেউ যাতে মামলা ঠুকে দিতে না পারেন, তার জন্য প্রতিষেধক বার করেছেন। মোদ্দা কথায় সাধারণ মানুষ যেন এ-ব্যাপারে নাক গলাতে না পারে তার বন্দোবস্ত পাকা করছেন। প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, অন্যের হয়ে অভিযোগ দায়ের করতে গেলে—সুপ্রিম কোর্টে হলে এক লক্ষ টাকা এবং হাইকোর্টে হলে পঞ্চাশ হাজার টাকা আগাম জমা দিয়ে তা করতে হবে। — বুঝুন কারবার! যেখানে এককালে আদালত বলেছিল — একখানা পোস্টকার্ডে লিখে অভিযোগ জানালেও তা বিবেচনার যোগ্য হবে, সেখানে সরকার এখন প্রস্তাব করছে যে, তার সাথে এক লক্ষ টাকার একখানা চেকও 'এটাচ' করে দিতে হবে!

—ফাল্‌তু মামলার বোঝা কমানোর জন্য কি অপূর্ব কায়দা? — মাথা বটে এঁদের! তবে 'গরীব জনগণের' বন্ধু এঁরা। তাই গরীবদের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। মাসিক আয় পাঁচশ টাকার নীচে যাদের, তাদের হয়ে আবেদন করতে গেলে আর এই 'সামান্য কটা' টাকা জমা রাখতে হবে না। ফলে গরীবদের স্বার্থ দেখা হচ্ছে না, বলা চলবে না। তবে হ্যাঁ, আয়ের সীমা নির্ণয়ের ফ্যাক্‌ড়া একটা রইল বটে! সেজন্য রাজনৈতিক দলের কুঁচো নেতারা তো রইলেনই। তাদের দিকটাও তো দেখতে হবে! তারাই বাছাই করে দেবেন — কে 'প্রকৃত' গরীব, কে নয়। চুকে গেল ঝামেলা। — গরীব, যেমন ছিলেন রইলেন 'সেফ'।

অন্যদিকে 'বড়' লোকেরাও সেফ ! তাদের হয়ে কাউকে মামলা লড়তে হয় না। তাঁরা ভালোই জানেন মামলা লড়তে হয়। তাঁদের গোমস্তা কিংবা রেস্ত কিছুর অভাব নেই। তবে জনস্বার্থ মামলার বেশিরভাগটাই পাকেচক্রে চলে যায় তাদেরই বিরুদ্ধে। কারণ দুর্নীতি ও অন্যায় করার সুযোগ তাদেরই বেশি। — ছিঁচকে দুর্নীতি নয়। বড়সড় দুর্নীতি তাঁরাই করেন, ক্ষমতা যাদের বেশি। ফলে তাদের 'মৌলিক অধিকার' ক্ষুণ্ণ না হয় সেটাও দেখা দরকার একটি 'নিরপেক্ষ' সরকারের। — তাই এই উদ্যোগ। এমন 'ফাল্‌তু ঝামেলা' করতে উৎসাহী না হয় কেউ, সেজন্যই এই উদ্যোগ আর এজন্য আরেকটি দাওয়াই-এর বন্দোবস্তও রাখা হয়েছে প্রস্তাবে। বলা হয়েছে যে, মামলা ঠুকে দিয়ে অবশেষে যদি অভিযোগ প্রমাণ না করা যায় তাহলে গেল গচ্ছিত টাকাটা। — বাজেয়াপ্ত করা হবে সে টাকা ফাল্‌তু ঝামেলা করার শাস্তি হিসেবে। উপরন্তু জরিমানাও ধার্য হতে পারে এর ওপর! 'মেসেজ' এর একটাই। কি দরকার 'জনস্বার্থ'র ঝঞ্ঝাটে যাওয়ার? তার চেয়ে ভালো নয় কি 'দলবেঁধে জনসেবা' (!) করা?

কিছু মানুষের inconvenence-এর কারণ হয়েছে আগেকার সংশোধনীটি সেটা ঠিকই। কিন্তু এই সামান্য সংশোধনটির সুবাদেই সম্ভব হয় নি কি আজীবন বেগার দেওয়া বহু মানুষের মুক্তি, সম্ভব হয় নি কি, নামমাত্র অভিযোগে বিশ বৎসর কারারুদ্ধ থাকা, ভুলে যাওয়া বেশ কিছু অভিযুক্তর মুক্তি, সম্ভব হয় নি কি, পাগল বলে আটকে রাখা বহু বন্দিনীর মুক্তি, সম্ভব হয় নি কি দরিদ্র বিধবার এগারো বছর ধরে আট্‌কে রাখা পেনসন পাওয়া, সম্ভব হয় নি কি ভূপাল গ্যাস-দুর্ঘটনাপীড়িত অসংখ্য মানুষের কিছু কিছু রিলিফ পাওয়া। এমন বহু ছোটো-বড় অন্যায়ের প্রতিকার অথবা প্রতিরোধ সম্ভব হয়েছিল এই সামান্য একটু সুযোগের সুবাদে।

আর সে সুযোগের অসদ্ব্যবহার ? — হ্যাঁ, হতেই পারে। সুযোগ আছে, তার অসদ্ব্যবহার নেই এমন হতে পারে না। কিন্তু বিবেচনার বিষয় হলো তুলনামূলকভাবে তার সংখ্যা কত? সেটা কি খতিয়ে দেখা হয়েছে? অনুমান করা যায়, তার সংখ্যা খুব বেশি হবে না। অনুসন্ধান করে দেখা হোক এই অল্পসংখ্যক অসদ্ব্যবহার কাদের দ্বারা হয়। সাধারণ মানুষ সহজে ঝামেলায় জড়াতে চাইবেন না স্বাভাবিক। কাদের দ্বারা হয়। সাধারণ মানুষ

সহজে ঝামেলায় জড়াতে চাইবেন না স্বাভাবিক। ফলে ক্ষমতা ও স্বার্থের লড়াই-তে ব্যস্ত যারা তাদেরই প্রয়োজন এ-ধরণের মামলা করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করা। আর এহেন অসদ্ব্যবহার রুখতে এমন দাওয়াই! সরি, বিশ্বাস করতে বলবেন না সেটা, কারণ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আছে যাদের অথবা তার জন্য লড়াই করছেন যিনি তার আদালতের জিম্মায় রাখার জন্য এটুকু অর্থের অভাব হবে, সেটা কেউ-ই বিশ্বাস করবে না। — নেতারাও করবেন না নিশ্চয়ই। কারণ তাদের দোর-গোড়াতেই ঘটছে সবকিছু। — তাহলে?

তাহলে কি এম. পি. কেনাবেচায় ঘুষ চালাচালির ব্যাপারে হওয়া মামলাকে বলবেন সুযোগের অসদ্ব্যবহার? এনরণ-চুক্তির পেছনে কি রহস্য আছে জানার চেষ্টায় মামলাকে বলবেন সুযোগের অসদ্ব্যবহার? 'হাওলা-গাওলা' মামলায় যদি কেউ উস্কানি দিয়ে থাকেন সেটা কি সুযোগের অসদ্ব্যবহার? অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য করে শ্রমিক-হত্যার বিরুদ্ধে মামলাকে কি বলবেন সুযোগের অসদ্ব্যবহার? দূষণকারী শিল্পের বিরুদ্ধে মামলাকে কি বলবেন সুযোগের অসদ্ব্যবহার? — আর এই ধরণের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এগিয়ে আসা মানুষদের জন্য ধার্য হলো দণ্ড। আর স্বার্থপর সুযোগ-সন্ধানীর জন্য ব্যবস্থা হলো রক্ষাকবচ! কি বিচার?

এমন ছোটো পত্রিকার কণ্ঠ বেশি দূর পৌঁছবে না জানা কথা। পৌঁছলে অবশ্যই দুঃখ পেতেন নেতাগণ। পিট সিগারের সেই বিখ্যাত What did you learn in school today গানটি শোনা থাকলে মনে করতেন, কতই না সঠিক বলেছেন ভদ্রলোক। গানটিতে আছে — পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করছেন — 'আজ কি কি শিখলে বাবা স্কুলে?' তার উত্তরে ছেলেটি কি কি শিখেছে আজ শিক্ষক মশায়ের কাছ থেকে সে-কথা জানাচ্ছে। এই নিয়ে গানটি। সে শিখেছে পুলিশই আসল বন্ধু, সরকারের হাত শক্ত করতে হবে ইত্যাদি। এর মধ্যে নেতাদের কথাও আছে। শিখেছে — তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ। শুধু লোকেরাই —। আচ্ছা তুলেই দেওয়া যাক — ওই লাইন দু'টি :

"What did you learn in school today
Dear little boy of mine?

. . . . .

Our leaders are finest men
We elect them again and again . . . . "

— তাহলে?

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পড়ুন ও অন্যদের পড়তে উৎসাহিত করুন। পত্রিকা সম্পর্কে আপনার মতামত/পরামর্শ/সমালোচনা শুনতে আগ্রহী।

□□

গ্রাহকদের প্রতি

যাদের গ্রাহক চাঁদা ডিসেম্বর 1996-এ শেষ হচ্ছে তাদের কাছে অনুরোধ : গ্রাহকপদ নবীকরণ করে নিন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা 20.00 টাকা (সডাক)।

টাকা পাঠাবার ঠিকানা
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী
P 252 লেকটাউন ব্লক A, কলকাতা 700 089

মতামত

একজন অবিজ্ঞানীর বিজ্ঞান প্রশ্ন প্রসঙ্গে

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

অনেক দিন পর *বি ও বি* হাতে পেয়ে খুবই ভালো লাগল। মনে হয়েছিল অনেক উদ্যোগের মতোই *বি ও বি*ও কালের গর্ভে নিক্ষিপ্ত, দেখছি *বি ও বি* কাল'দোষ' থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে, আনতে চাইছে খোলা হওয়া। 'অর্থনীতি বেচে খাওয়া' শুভেন্দু দাশগুপ্ত-র 'একজন অবিজ্ঞানীর বিজ্ঞান প্রশ্ন' এই প্রচেষ্টারই অঙ্গ বিশেষ বলে মনে হচ্ছে।

প্রতিকূল প্রকৃতির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, যুক্তি-তর্ক, পরীক্ষা-নি রীক্ষার মাধ্যমে অহর্নিশ সংগ্রাম করে চলেছে মানুষ। আর এই সংগ্রামের ফল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। অন্যদিকে গোষ্ঠী আধিপত্য গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গিয়ে মানুষ মানুষের সাথে যে লড়াই করছে সেই লড়াই-ই জন্ম দিয়েছে, বিকশিত করছে সমাজবিজ্ঞানকে। যে প্রশ্ন শুভেন্দু দাশগুপ্ত উত্থাপন করেছেন তার উত্তর দেওয়ার দায় তাঁর মতো বিজ্ঞানীদেঁরই। বিশ্বজোড়া ফ্যাসিবাদকে বলতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞান আইনস্টাইনের নেতৃত্বে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মেধা পরমাণু প্রকল্পের রচনা করে কোনো অন্যায় করেন নি — হিরোশিমা নাগাসাকির দুঃখবহ ঘটনা সত্ত্বেও। কিন্তু তখনই তাঁরা বলেছেন যে, বাজার দখলের আরও ভয়ানক লড়াই শুরু হয়ে যাবে এই অস্ত্র দিয়ে। তাই দার্শনিক নীলস বোরের দাবি ছিল, পরমাণু বোমার একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান। বোধহয় এই দাবিপূরণ হয়েছিল বলেই তার হাজারো অশুদ্ধতা নিয়ে আজও বেঁচে আছে পৃথিবী।

সমাজবাদের, সাম্যবাদের প্রবক্তারা বিভিন্ন সময় বলেছেন, সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদে উত্তরণের পর্যায়ে যখন মানুষকে আর মানুষের সাথে সংগ্রাম করতে হবে না তখন তার সমগ্র উদ্যোগ, মেধা নিয়োজিত হবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশে এবং তখন বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতি ঘটবে এমন উচ্চতায় যে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত উদাহরণ ম্লান হয়ে যাবে। অথচ কি বিচিত্র পরিহাস—সোভিয়েত তন্ত্রের বিপর্যয়ের মূল কারণ হিসাবে বলা হয়েছে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি ! হয়তো তাই। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চোখ ধাঁধানো আকর্ষণ যে অসীম আকাঙ্ক্ষার—ভোগবাদের জন্ম দেয়, হাজারো পণ্যের দ্রুত প্রসাধনশীল বাজারের জন্ম দেয় এবং সে-সব থেকে যে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয় তার সমাধান চালু সামাজিক কাঠামোর মধ্যে সম্ভব হয় না, সমাজ ভেঙে পড়ে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এই অভাবনীয় উন্নতি ও মানুষের কল্যাণের প্রয়োজন নেই। মানুষের কল্যাণের পরিবর্তে তা যদি তার অকল্যাণের কারণ হয় তবে রাশ টেনে ধরার দায় তো রাষ্ট্রের এবং সেই সুবাদে রাজনীতিকদের এবং অর্থনীতিক-দেরও বটে। কৃষিকাজে ব্যবহৃত ট্রাক্টরের উৎপাদনে বা উন্নত শস্য বীজের গবেষণায় মূলধনের বিনিয়োগ হবে, না রঙিন টেলিভিশনের বা ভিডিও গেমের আমদানিতে অর্থ খরচ হবে সে সিদ্ধান্ত তো রাষ্ট্রেরই। এবং সে সিদ্ধান্ত কি হবে তা নির্ভর করছে রাষ্ট্রের দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের মূল্যবোধের ওপর।

একটা সময় ছিল, যখন প্রজ্বলিত দেশপ্রেম পরাধীন দেশের ছাত্র-সমাজকে জগৎ সভায় তাঁদের যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে উদ্বুদ্ধ করে ছিল, তেঁতুলপাতা চিবিয়ে বুনো রামনাথের মতো শিক্ষকরা তাঁদের ঐ উদ্যোগকে সক্রিয় সমর্থন করেছিলেন। তাই দেশ পেয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, সি ভি রমনের মতো এক ঝাঁক বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীদের, পেয়েছিল এমন কিছু আর্থনীতিক রাজনীতিক এবং সাহিত্যিক, যাদের নাম বিশ্বের সেরাদের সঙ্গে একসাথে উচ্চারিত হবে চিরকাল, এ-সবই সম্ভব হয়েছিল পরাধীন ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই — শুধুমাত্র কেরানি তৈরির কারখানা হিসেবে তা বিবেচিত হলেও। আসলে এই শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক অংশ ছিলেন যাঁরা সেই শিক্ষক সেই ছাত্ররা ছিলেন অন্য এক মূল্যবোধে দীক্ষিত, স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে এই মূল্যবোধ শিক্ষাসহ সমাজের সমস্ত ব্যবস্থা থেকেই প্রায় অন্তর্হিত। আর আজ আকণ্ঠ ভোগবাদে নিমজ্জিত মানুষ সম্পূর্ণ এক বিপরীত মূল্যবোধে আচ্ছন্ন। তাই বিজ্ঞান-সর্বস্বতা নয়, ভোগবাদই আমাদের সমাজের চালিকাশক্তি, অন্তত এই মুহূর্তে।

বিজ্ঞান-সর্বস্বতাই যদি আমাদের সমাজের চালিকাশক্তি হতো তবে দুটো ঘটনা দেখতে পেতাম। এক, তৈরি হতো বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ, যে মানুষ যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে, ঘটনার বিশ্লেষণ করত, বিচার করত — মনগড়া ধারণার সাহায্যে নয়।

যে মানুষ সত্যকে ভয় পায় না ; যে মানুষ বিজ্ঞানকে ব্যবহার করত, প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের আদর্শ অনুযায়ী, জনগণের সেবার জন্য, সীমাহীন ভোগের উপকরণ আহরণের উদ্দেশ্যে নয়। দুই, তৈরি হতো অনেক অনেক বসু, সাহা এবং রমন ; নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি তৈরি করতে পারতাম নিজেরাই; Dunkel বা WTO কাউকেই ভয় পেতে হতো না। 'বিজ্ঞান-সর্বস্বতা' যদি কোথাও থাকে, তা আছে আমাদের কথায়, প্রচারে বা বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকৃত ব্যবহারের মানসিকতায়। অন্তত প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানশিক্ষার কর্মসূচীতে তা পরিত্যক্ত না হলেও যে অবহেলিত দু-একটা উদাহরণ দিলেই সে কথা স্পষ্ট হবে। বিজ্ঞানশিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান নিষ্ঠুরভাবে অনুপস্থিত !

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মূলত গণিতের, মিশ্র গণিতের ছাত্র ছিলেন। পদার্থবিজ্ঞান ছিল গৌণ বিষয়। ঢাকা থেকে বহু ছাত্র অধ্যাপক সাহাকে লিখেছেন পদার্থবিজ্ঞানে ব্যবহৃত এমন সব যন্ত্রের কথা— যা এখনকার ছাত্ররা, যাঁরা ঐ বিষয়টিকে গৌণ বিষয় হিসেবে পড়েন, চাক্ষুষ করেছেন বলে মনে হয় না। অর্থাৎ গত ৭০/৮০ বছরে উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা, অবনতি হয়েছে অনেক। উচ্চ মাধ্যমিকের একজন শিক্ষককে বলেছিলাম, আপনারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানে শতকরা ৯০ বা ১০০ নম্বর দিচ্ছেন দিন, কেননা শিক্ষা-প্রশাসনের সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ কর্তারা তাই চান। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠক্রমের অন্তর্গত যন্ত্রপাতি, এক্সপেরিমেন্টের সাথে পরিচয় না করিয়ে তা দিচ্ছেন কেন? এর উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন তা নিছকই সময়ের এবং অর্থের 'অপচয়' বলেই অনেকেই মনে করেন — কাজেই সম্ভব হয় না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও অনুরূপ। অর্থাৎ বিজ্ঞান এক্সপেরিমেন্ট-ভিত্তিক বিষয় হলেও বিজ্ঞানশিক্ষার আসর থেকে তা কার্যকরভাবে নির্বাসিত। এরপরেও বলতে হবে— আমাদের শয়নে-স্বপনে, চলনে-বলনে সর্বদাই বিজ্ঞান বিরাজিত?

সম্পাদক মহাশয় মাপ করবেন, শুভেন্দু দাশগুপ্তর বিজ্ঞান প্রশ্নের কোনো উত্তর দেওয়া এই চিঠির বিষয়বস্তু নয়, সে সাধ্য আমার নেই, শুধু চেয়েছিলাম বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নিয়ে যে ব্যভিচার তাকে বিজ্ঞান হিসেবে চালানোর যে অপচেষ্টা হচ্ছে তার প্রতিবাদ করতে, তাই করেছি। নমস্কারান্তে —

সুভাষচন্দ্র সামন্ত
মেদিনীপুর।

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বরূপ

অধ্যাপক সিদ্ধার্থ রায় 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ ও সংকট' প্রবন্ধে অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়ের ওপর বলিষ্ঠ এবং সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষক আন্দোলনের বিকল্প প্রবক্তারা দীর্ঘদিন নানাভাবে এই কথাগুলি বলে আসছেন। অধ্যাপক রায়ের প্রবন্ধটি যেন সে সমস্ত বক্তব্যের একটি সুসংবদ্ধ রূপ।

এই প্রবন্ধের দু-একটা বিষয় সম্বন্ধে সামান্য মন্তব্য করা যেতে পারে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তাঁরা ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে শিক্ষা-ক্ষেত্রে রাজনীতি-করণকে 'গণতন্ত্রীকরণ' আখ্যা দিয়েছেন। শাসকদের হাতে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুবিচার, আইন, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন প্রভৃতি সমস্ত শব্দগুলিই বিধ্বস্ত এবং কলুষিত। রাষ্ট্রের সমাজিক ক্ষেত্রগুলিকে কুক্ষিগত করার প্রয়োজনে শাসকদল এবং তাদের স্তাবকেরা ঐ শব্দগুলি ব্যবহার করছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার ঐ শব্দগুলিই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াবার স্তম্ভ, এগিয়ে যাবার পথ প্রদর্শক। শিক্ষাক্ষেত্রে 'গণতন্ত্রীকরণ' তো সত্যিই প্রয়োজন। তবে সে গণতন্ত্র স্লোগানসর্বস্ব বুলিতে পর্যবসিত হলে চলবে না। শিক্ষার প্রতি স্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপরেখা আমাদের নির্দ্ধারণ করতে হবে এবং তা নিয়ে সোচ্চার হতে হবে। বর্তমান প্রবন্ধটিই তার প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে।

বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা পরিষদের অধীনে গবেষণাগার-গুলির ব্যর্থতা নিয়ে দ্বিমত নেই, কিন্তু এই সব গবেষণাগার 'প্রতিযোগিতামূলক খরচে' নির্দিষ্ট মানের কারিগরি দিতে না পারার জন্যেই দেশীয় কারিগরি বর্জিত হয়েছে —এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী মত, প্রবন্ধ ইত্যাদি *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*তেই প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি যে-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে সেখানেই ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স সম্পর্কে যে প্রতিবেদনটি ছাপা হয়েছে তাতেই বহু ভারতীয় শিল্পের ব্যর্থতার কারণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এছাড়াও প্রতিযোগিতামূলক খরচ, বড় বাঁধ, বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাসায়নিক সার, পেট্রোকেমিক্যাল্‌স, বিদেশী প্রযুক্তি এসব নিয়ে বিতর্ক সারা বিশ্বেই রয়েছে। এই বিষয়গুলি আমাদের শিল্প, অর্থনীতি, সমাজজীবন, পরিকল্পনা, শিক্ষা ইত্যাদিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। বির্তকটি আছে বলেই অনেক সময় বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীরা সামগ্রিকভাবে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াচ্ছেন (*বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*র প্রবন্ধেও)।

আলোচনা-বিতর্ক-পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রযুক্তি এবং তদ্‌সম্বন্ধীয় গবেষণা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছাতে পারলে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য গবেষণাগারের গবেষণা সম্পর্কে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা যেতে পারে। বিভিন্ন গবেষণার মূল্যায়নও তখনই হতে পারে। এই প্রসঙ্গে ১৯৯০-এ কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা ১৯৮৬-র জাতীয় শিক্ষানীতি পর্যালোচনার জন্যে যে কমিটি গঠিত হয় তাদের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা হলো।

'In our system of education, we are by and large, ignoring the rich treasure of traditional knowledge and wisdom derived often empirically over several hundreds of years or longer. Such traditional knowledge and wisdom are available in diverse areas like agriculture, land-management, watershed planning, forestry, ecological balance, housing, medicine, cottage industries etc. These need to be integrated with the content and process of education.

অধ্যাপক রায় বিশ্ববিদ্যালয় ও বাইরের সমাজের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে সমাজের এক বিরাট অংশের সম্যক সচেতনতার অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা বড় কারণ যাকে অবলম্বন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় রাজনীতির প্রবেশ ঘটছে। সামগ্রিক শিক্ষা ও সচেতনতার বাতাবরণে বিশ্ববিদ্যালয় যে পরিমাণ স্বাধিকার বজায় রাখতে পারে, উদাসীনতার প্রেক্ষাপটে তা বহাল রাখা সম্ভব নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের প্রধান দুর্বলতা হলো প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা এবং বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার বিচ্ছিন্নতা। এ নিয়ে বহু আলোচনা হচ্ছে। তথ্যেরও অভাব নেই কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। সমাজ যেমন শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন আমরাও ততোধিক তৃণমূলে শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে উদাসীন। নিরক্ষরতা দূরীকরণের নামে প্রহসন সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অনুপস্থিতি, শিক্ষা পরিকল্পনার ত্রুটি ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আমরা উদ্যোগী না হলে আমাদের শত প্রয়াস সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের মানুষজন বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি ডিগ্রি দেবার সংস্থান বলেই ভাববে।

অধ্যাপক রায় আলোচনার শুরুটা করেছেন, একে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারলে উপকৃত হবো আমরা সবাই।

বুদ্ধদেব বাগচী
কলকাতা

পরিক্রমা

শব্দ নয় : আদালত বলেছে

হাইকোর্টের হুকুম হয়েছে — প্রকাশ্যস্থানে আওয়াজ নয়। নির্দিষ্ট মাত্রার ওপরে আওয়াজ যত মহৎ উদ্দেশ্যেই হোক, করা চলবে না। সকাল সন্ধ্যে 'আজান' অথবা আন্দোলনের জিগির সবই এই হুকুমের আওতায় পড়ছে। 'মাইক' বাজিয়ে চলবে না এসব। বলে দেওয়া হয়েছে।

শব্দ মাত্রা ছাড়াচ্ছে কিনা দেখার দায়িত্ব সরকারের। বেজায় ফাঁপরে পড়েছেন সরকার তথা শাসকদল। কাকে সামলাবেন? একদিকে কোর্ট। অন্যদিকে ভোটার জনগণ। অবস্থা সামাল দিতে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগী হয়েছিলেন। ডেকেছিলেন ধর্মগুরু আর রাজনীতির দাদাদের। বাবারে-বাছারে বলে যদি সামাল দেওয়া যায় কিন্তু ভেস্তে গেছে উদ্যোগ। অপেক্ষাকৃত দুর্বল পক্ষেরা নিয়ম মানতে নিমরাজি হয়েছিলেন। প্রবলতর পক্ষেরা নারাজ।

ব্যাপারটা মানুষের কানের প্রশ্ন নিয়ে হলেও গুরু ও দাদাদের মানের প্রশ্নটিও কম নয়। মানুষের কিসে ভালো সে তো তাঁরাই ভালো জানেন। এবং এতদিন তাঁরাই তো দেখে আসছিলেন ব্যাপারটা। হঠাৎ এর মধ্যে কোর্ট এল কোথা থেকে? খট্‌কাটা বোধহয় এইখানেই। তবে মুখে অন্য কথা বলেছেন।

জনৈক মুসলমান ধর্মগুরুর বিস্মিত উক্তি — পঁচিশবার নয় পঞ্চাশবার নয় সারাদিনে সাকুল্যে পাঁচবার 'আজান' দেওয়া— তাও মাত্র মিনিট দশ-পনেরো করে। এটুকু মাইকের আওয়াজে কি এমন কানের ব্যামো হতে পারে বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি। ফলে হাইকোর্টের এমন নির্দেশ মানতে পারলেন না। এর বিরুদ্ধে তাদের সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অর্থাৎ অন্তবর্তী পর্বে 'মাইক-ই আজান' যেমন চলছে চলবে— বোঝাই যায়।

একজন রাজনীতিক দলের নেতা বুঝে উঠতে পারছেন না তারা কিভাবে জনগণের কানে কাঠি দিচ্ছেন। মাঝে মধ্যে সিধু-কানু ডহরে লোক জড়ো করে একযোগে গলা সাধেন। এতে কার কি এসে যায়? তাই এই নির্দেশ তাদের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে মনে হচ্ছে। ক্ষমতাসীন একটি দলের নেতাও

বিরক্ত। তিনি জানাচ্ছেন যে, তাঁর দীর্ঘ গলা-বাজির জীবনে এমন একজনকেও দেখেন নি যার এতে কানের পর্দা ফেঁসেছে। আশঙ্কা এখন—এর প্রতিবাদে তিনি এক সারাদিনব্যাপী 'মাইক-দৌড়ের' ডাক দিয়ে না বসেন।

তবে এ-নিয়ে খুব একটা জবরদস্তি না করলেও চলবে বলে মনে হচ্ছে। কারণ মাইকের প্রতি আস্থা আর খুব বেশিদিন থাকবে বলে মনে হয় না। টিভির আকর্ষণ যে হারে বাড়ছে তাতে বক্তৃতা বা কীর্তন শোনাবার লোক জোটানো শক্ত হয়ে পড়ছে। ফলে তাদের অন্য রাস্তা দেখতেই হবে। তাতেও যদি না হয় তো শেষে রেগে-মেগে 'অমৃত কথা না শোনেদের' ধরে ধরে 'কানে গজাল ঠুকে' শোনানোর ব্যবস্থা না হয়—সেটাই ভয়ের।

□□

নিউক-বিরোধী জনস্বার্থ মামলা হোক

কেন্দ্রের পাঁচ-মিশেলী দলের সরকারের প্রধান মস্কো গিয়েছিলেন — হাতে নিয়ে ব্যবসায়িক লেনদেনের হরেক ফিরিস্তি। যার মধ্যে ছিল দুটি থার্মোনিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের আর্জি। আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। নানান 'বাধা' সত্ত্বেও বন্ধু দেশের এই আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারেন নি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। বাধা আসছিল তাঁর আরেক বন্ধুর দিক থেকে। তিনি হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ভারত দুটি নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট পাচ্ছে — একেবারে মুফতে না হলেও সহজ শর্তে। দাম টাকায় দিলেও চলবে। তাও এক সাথে নয়। এখন কিছু। পরে বাদবাকি। যন্ত্রপাতি মাল-মশলা যা লাগবে তাঁরাই দেবেন। এমনকি প্ল্যান্ট বসানোর ঝক্কি-ঝামেলাও পোয়াবেন ওনারাই। — 'এমন বন্ধু আর কে আছে?' অনেকে বলছেন — বিরাট একটা দাঁও মারা গেল! হতে পারে। দাঁও তো নানানরকম হয়। কাগজে-পত্রে দেখছি সে-সব। সেটা আলাদা প্রশ্ন। প্রশ্ন হলো, নিউক্লিয়ার পাওয়ারের নামে আর কত অপচয় দেখব? এমনিতেই প্রচণ্ড ব্যয়বহুল এমন প্রকল্প। যে কটি প্ল্যান্ট আছে এদেশে সেগুলোই ধুঁকছে। উৎপাদন সামান্যই। খুচ্‌খাচ দুর্ঘটনা লেগেই আছে। তেজস্ক্রিয় দূষণের বাড়তি ঝামেলা। দূষণের ব্যাপারে এ-দেশের রিয়াক্টরগুলোর বেজায় দুর্নাম। সব মিলিয়ে ভারতের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রোগ্রাম পুরো 'ফ্লপ'। দুনিয়াশুদ্ধ লোক জানে সে-কথা। *বুলেটিন অফ অ্যাটমিক সায়েন্টিস্ট*-এ ড. আরনেটের একটি লেখার বিষয় গত সংখ্যা *বি ও বি*'-তে বলা হয়েছিল—স্মরণ থাকতে পারে পাঠকদের। এর পরও ফের দুটো প্ল্যান্টের জন্য এত হ্যা পিতোশ! তাও রাশিয়ার প্ল্যান্ট! তার খুব সুনাম আছে বলে তো শোনা যায় না। পৃথিবীর সব থেকে বড় রিয়াক্টর দুর্ঘটনা হয়েছিল প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ারই একটি রাজ্যে। যার জের আজো কাটে নি। আর এই প্ল্যান্ট দুটোর জন্য গচ্চা যাবে সতের হাজার কোটি টাকা! প্রস্তাবিত উৎপাদন ক্ষমতা দু-হাজার মেগাওয়াট। আসল উৎপাদন? এদেশের রেকর্ড ধরলে—বিশ শতাংশ! তাহলে মেগাওয়াট পিছু ব্যয় কত দাঁড়াল? মনে রাখতে হবে, প্রকল্প ব্যয় কিন্তু কখনই প্রস্তাবিত অঙ্কে সীমাবদ্ধ থাকে না।

প্রশ্ন হলো—বড় বড় বাজেটের প্রকল্পেই কেন নেতাদের এত উৎসাহ। এমন অপচয় কি চলতেই থাকবে? ঠেকানো দরকার এই অপচয়। কিন্তু কিভাবে? আবেদন নিবেদনে কাজ হবে না—জানা কথা।

একটি উপায় সম্ভবত, আদালতে হত্যে দেওয়া। সেটাই একমাত্র পন্থা। ওয়াকিবহাল লোকজনকে উদ্যোগ নিতে হবে। যেমন দেখা গিয়েছিল এম. পি. কেনাবেচার মামলায় অথবা 'শিল্পদূষণ'বিষয়ক 'জনস্বার্থ মামলায়'। অকেজো ও বিপজ্জনক শিল্প-প্রকল্পে ক্রমাগত অর্থ অপচয়টা কি 'জনস্বার্থ বিরোধী' অপকর্ম বলে দাঁড় করানো যায় না? মামলা করা যায় না কি এর বিরুদ্ধে? টেকনিক্যাল 'নো-হাউ'-এর অভাব হবে না। দরকার আইনের প্যাঁচে ব্যাপারটাকে সাজিয়ে ফেলা। একেবারেই অসম্ভব কি কাজটা?

□□

মানুষের ক্লোন আর কতদূর

খবরে প্রকাশ একটি ভেড়ার দেহ-কোষ থেকে একটি পূর্ণাবয়ব ভেড়া তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। প্রজনন কোষের মিলন ব্যাতিরেকেই। ক্লোনিং পদ্ধতিতে। বহুদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল এমন সম্ভাবনার কথা। গাছের ক্ষেত্রে তো হচ্ছিলই বহুদিন। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে সম্ভব হল এই প্রথম। এজন্য যা করা হয়েছে সংক্ষেপে তা এইরকম। একটি স্ত্রী-ভেড়ার স্তন-গ্রন্থির কোষের নিউক্লিয়াসটিকে আলাদা করে নিয়ে অন্য একটি ভেড়ার পূর্ণতা-প্রাপ্ত ডিম্ব-কোষের নিউক্লিয়াসের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া

হয়েছিল। অবশেষে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন এবং ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এই কোষটিকে স্থাপন করা হয় তৃতীয় একটি ভেড়ার জরায়ুতে। নির্দিষ্ট সময় পর জন্ম হয় পৃথিবীর প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্লোন — যে ভেড়া থেকে নিউক্লিয়াসটি নেওয়া হয়েছিল তার হুবহু নকল একটি ভেড়া। এখন তার বয়স সাত মাস। নাম রাখা হয়েছে—'ডলি'।

প্রচণ্ড জটিল গোটা কর্মকাণ্ডটি। বহু বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে সম্ভব হয়েছে এ-কাজটি। যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। এই ক্লোনিং প্রক্রিয়াটির স্বত্ব কিনে নিয়েছে একটি বাণিজ্যিক সংস্থা। — পি পি এল থেরাপিউটিক্স্।

কিন্তু এরপর? —বোধহয় এরপর আরেকটি খবরের প্রতীক্ষা। যেদিন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হবে যে—'বিশ্বের প্রথম মানব শিশুটির জন্ম হলো ক্লোনিং পদ্ধতিতে।'

হয়তো এখনও খুব সহজ নয় কাজটি। কিন্তু অসম্ভবও নয়। শোনা যাচ্ছে ভেড়া-সৃষ্টির সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর আরো একটি সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে। জানা গেছে একটি ক্লোনিং পদ্ধতিতে একটি বানরের সৃষ্টি করাও নাকি সম্ভব হয়েছে। বানর যদি সম্ভব হয় তো মানুষ আর কদ্দূর?

নবলব্ধ এই জ্ঞান এখন কাজে লাগানো হবে কিভাবে সেটাই প্রশ্ন। ইতিমধ্যে জল্পনা-কল্পনা ডানা মেলেছে বহুদূর। লেখা হয়ে গেছে বহু তথ্য-কাহিনীও। কিন্তু যারা এর স্বত্ব ক্রয় করল তাঁরা কি ভাবছেন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের প্রশ্ন করা হলে পাওয়া গেছে মামুলি উত্তর। ওঁরা জানাচ্ছেন — এই গবেষণার ফল নাকি বার্ধক্যের কারণ জানতে সাহায্যে করবে। আর জেনেটিক্স্ বিষয়ে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হলো অনেকখানি। বিশুদ্ধ জ্ঞান-লাভের জন্যই কি এই স্বত্ব ক্রয়? তবে এইটুকুও যোগ করেছেন তাঁরা যে, এই জ্ঞান ওষুধ উৎপাদনের খরচ কমাতে সাহায্য করবে। —কিভাবে, সেকথা তাঁরা জানান নি। আর তাতে ওষুধের বিক্রিমূল্য কমবে কিনা তাও বলেন নি খুলে।

অন্যদিকে নীতিগত প্রশ্ন নিয়েও সোচ্চার অনেকে। এভাবে কৃত্রিম উপায়ে প্রাণের সৃষ্টি উচিত কিনা ভাবছেন অনেকে। অনেকে ভাবছেন, এভাবে মানুষ সৃষ্টি হলে সেই মনুষ্যগণ 'আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে' ভুগবে না তো? দুর্ভাবনার বিষয় বটে! এখানেই শেষ নয়। অনেকে আরেকটু সেন্টিমেন্টাল সমস্যা নিয়ে ভাবছেন। ক্লোনেদের সাথে কেউ প্রেম করতে চাইবেন কিনা এই নিয়েও ভাবিত অনেকে। আরেকটি গভীরতর তাৎপর্যপূর্ণ কথা খুব বেশি লোক ভেবেই দেখছেন না। এমন অভিযোগও করেছেন কেউ কেউ। তাদের বক্তব্য হলো— এতদিনকার সযত্ন লালিত একটি 'মিথ' যে ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। এতদিন বিশ্বাস ছিল নারী এবং পুরুষ উভয়ের অবদান ব্যতীত মনুষ্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। এখন দেখা যাচ্ছে, পুরুষ ছাড়াও হতে পারে সৃষ্টি। এই সংবাদ পুরুষকুলের মনস্তত্ত্বে কি প্রভাব ফেলে সেটাই দেখার এখন।

সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ এর ভালো মন্দ নিয়ে ভেবে আন্দোলিত হচ্ছেন। তবে হিন্দী ফিল্মের প্রোডিউসাররা নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন এই সংবাদে। কারণ বিশেষ বিশেষ নায়ক-নায়িকাদের দিয়ে নাচন-কোদন করাতে ক্রমশই মোটা অঙ্কের গাঁট-গচ্চা যাচ্ছে তাদের। তারা ভাবছেন, এই সমস্যার সুরাহা হলো একটা। মওকা মতো হিরো-হিরোইনদের খানকতক কপি করিয়ে নিতে পারলেই নিশ্চিন্তি।

তবে যে যাই বলুক, এক্ষুনি কেউ মানুষ ক্লোন করবার ঝক্কি পোয়াতে যাবে না বলেই বিশ্বাস। —বলি, মানুষের সাপ্লাই কি শর্ট পড়েছে নাকি? আর দরও কি খুব চড়া? মানুষের চাপে তো সাড়া ধরিত্রীর ত্রাহি অবস্থা। এর ওপর আরও? তবে হ্যাঁ, প্রযুক্তি পেটেন্ট থাকলে মন্দ নয়। তেমন যদি কখনও পরিস্থিতি হয় যে, ধরিত্রী মায়ের বুক খালি অবস্থা, তখন দুচার পিস যা থাকবে তাই থেকে যত ইচ্ছে কপি করে নেওয়া যাবে। মনোমত মাপে ও প্রকৃতিতে। সেই মনুষ্যদের একটি সুবিধেও থাকবে। 'কোথা হইতে আসিলাম' —হেন ধোঁয়াটে প্রশ্নের ঘূর্ণিতে পড়তে হবে না। এমন বেয়াড়া প্রশ্ন যদি বা জাগে কারো মনে, তবে তাকে আশ্বস্ত করে বলে দেওয়া যাবে — 'ধরো, তুমি অমুকের কানের লতি হইতে আসিয়াছ'। এই সত্য জেনে তার দার্শনিক সত্তা নিশ্চয়ই নিদ্রা যেতে পারবে নিশ্চিন্তে !

র. চ.

শিক্ষাব্যবস্থার নানাদিক সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণ

মানস জোয়ারদার-এর

চ্যান্সেলর অফ ভাইস

প্রকাশক : নান্দীমুখ সংসদ

VIGNAN O VIGNANKARMI Vol XIX No. 1-2 Jan.-June 1997 Rn. No. 34929/79

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী, পি 252, লেক টাউন, ব্লক A, কলকাতা 700 089

গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন। কিছু কিছু পুরনো সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। প্রয়োজনে লিখুন।
লেখা পাঠান। সমাজ ও বিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্কের যে কোনো বিষয়ে। স্থানীয় সমস্যাভিত্তিক রিপোর্ট, অনুসন্ধান সমীক্ষা ইত্যাদি সাদরে বিবেচিত হবে।
এজেন্সি দেওয়া হয়। একসঙ্গে অন্তত পাঁচ কপি।
কমিশন শতকরা পঁচিশ।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি, 117, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা 700 009 থেকে মুদ্রিত। লেজার কম্পোজ : শিবা লেজার সেটার, 89/1, গড়পার রোড, কলকাতা 700 009।